পোনুর স্পেনদর্শন

(ও ভূয়োদর্শন, সাংখ্যদর্শন, ছিলিমদর্শন ইত্যাদি)

সুমিত রায়

২০০৮–২০০৯

কুণ্ডু স্পেশালের নাম নিশ্চয় শুনেছেন। আমাদের বাপ–দাদারা তাদের বিধবা মা বা পিসিদের কুণ্ডু স্পেশালে চড়িয়ে তীর্থ দর্শনে পাঠাতেন আর সেই সুযোগে কোলকাতায় নির্বিঘ্নে একটু মজা মেরে নিতেন। মজা মানে এই একটু রামপাখি ভক্ষণ, একটু বেশী মাত্রায় অম্রুতাঞ্জন সেবন এই আর কী। আপনিও যে সে পথে পা বাড়াননি তা বুকে হাত দিয়ে কি বলতে পারবেন? কুণ্ডু স্পেশালের হাতে ভাড়াটা একবার ধরিয়ে দিলেই আর চিন্তা ছিলো না কোনো, ট্রেনের টিকিট কাটা থেকে মালপত্র বোঝাই করা, তীর্থস্থানে হোটেল বা ধর্মশালা (গোড়াতে ছিলো আস্ত ট্রেন বা সাইডিংয়ে কেটে রাখা বোগি) বুক করা, পাণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচানো, খাঁটি গণেশ মার্কা সরষের তেলে বেগুন ভেজে খাওয়ানো, ইত্যাদি ইত্যাদি সব ব্যবস্থা ঐ তাঁরাই করতেন আর যাত্রীরা পরস্পরের শাড়ীর আঁচল বা কাছা ধরে বৈতরণী পার হয়ে গাদা গাদা পুণ্য সঞ্চয় করে ফিরে আসতেন। অসুবিধেও ছিলো বই কি একটু আধটু। এক তো কোথায় যাবো, কী করবো তার খুব একটা রদবদল হোতো না, খাঁটি বোষ্টম হলেও চামুণ্ডার মন্দিরে ঢুঁ মারতে হোতো, নাক চুলকোলেও কাছাটি ছাড়ার জো নেই, তারকেশ্বরের ভীড়ে হারিয়ে আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। ভোর সাতটার মধ্যে সারাদিনের জন্য পুণ্যসঞ্চয়ের ধান্ধায় বেরোতে হবে, কিন্তু মুস্কিল হোলো ঐ যে আমাদের সরস্বতী বলেছিলো ''না পেলে কী করে যাই মা''। সরস্বতী ছিলো বাচ্চার আয়া, তাকে গিন্নী বলেছিলেন, বাচ্চার কাছে সকালে আসার আগে সব কৃত্যকর্ম সেরে এসো বাপু। (সহযাত্রিণীর সৌজন্যে)।

সায়েবী কুণ্ডু স্পেশালেও সেই একই ব্যাপার। দেশের কুণ্ডু স্পেশালে নাহয় প্রাণঘাতী বাঙালী হিন্দি বলে বাথরুম খোঁজার একটা চেষ্টা করা যেতো, কিন্তু এখানে গাইড দিদিমণি না থাকলে আমরা বাক্যহারা –– স্লো গ্লোবের ভেতর বন্দী। এসব জেনেও মেরি মাতার ডাক উপেক্ষা করা গেলো না, স্পেন আর পর্তুগাল দর্শনে বেরিয়ে পড়লাম। sale –এ মরক্কোও পাওয়া গেলো, বুক টিপটিপ করে সেটাও জুড়ে নেওয়া গেলো, ভদ্রাসন বন্ধক না দিয়েই। আর তাছাড়া সৎসঙ্গের পুণ্যলাভ তো আছেই। এদিকে আবার দেখুন আপনি মইটি কেড়ে পালালেন বলে আমার জ্ঞানসঞ্চয়ের ক্রেডিট একটু খর্ব হোলো কিন্তু বৃক্ষারূঢ় থাকার কারণে আমার পুণ্যের ডেবিটে বেশী চাপ পড়লোনা। [চিত্র ১]

স্পেন। অবশ্যই টেক্সাসের থেকে ছোটো (প্রায় এক–তৃতীয়াংশ ছোটো)। তাহলেও ইউরোপের মাপকাঠি নাড়লে বেশ বড়ো –– সাইজে তিন নম্বর, ইউক্রেন আর ফ্রান্সের পরেই। আমাদের ভারতবাসীদের সঙ্গে স্পেনের পরিচয় আমাদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড–ফ্রান্স–জার্মানীর যা পরিচয় তার থেকে কম। বেশী তাড়া লাগালে আমরা আবার পর্তুগালের সঙ্গে স্পেন গুলিয়ে ফেলি। আসলে আমাদের খুব একটা দোষ নেই, পর্তুগাল স্পেনের অতি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, দুই রাষ্ট্র মিলে আইবেরীয় উপদ্বীপ Iberian Peninsula, খেয়োখেয়িও করেছে, আবার ভালোবাসাবাসিও আছে। যেমন আমরা আর বাংলাদেশ আর কি। এদিকে আবার পর্তুগিজ ভাস্কো ডা গামার কৃপায় গোয়া, দমন, দিউ, কালিকট ইত্যাদি আমাদের স্মরণে আসে, অনেক পর্তুগিজ নামও আমাদের মধ্যে এখনো চালু –– গনসালভেস, ব্রাগাঞ্জা, ডিসুজা ইত্যাদি। খুঁজে দেখলে আমাদের কারো কারো মধ্যে দুয়েকফোঁটা পর্তুগিজ রক্তও যে পাওয়া যাবেনা তা কী জোর গলায় বলতে পারবেন, য়্যাঁ? শেষ পর্যন্ত অবশ্য দেখা গেলো যে মনে রাখার অনেক কিছু স্পেনেও আছে, হিসেব করে দেখলে পর্তুগালের চেয়ে অনেক বেশী। তার মধ্যে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলার অংশ কম নয় – ক্রমশ প্রকাশ্য।

যাকগে, স্পেনের ধারে কাছে অনেক কিছুই আছে। পাহাড় আছে (পিরেনীজ, সিয়েরা) –– স্পেনের উচ্চতা সুইট্জারল্যাণ্ডের পরেই –– উপসাগর আছে (বিস্কে), সাগর আছে (ভূমধ্য), এমনকী মহাসাগরও আছে (অতলান্ত)। মহাদেশও আছে (আফ্রিকা)। বর্ষা হয়, ভিজে মাটি আছে, তেমনই আছে রুক্ষ সমতলভূমি। দক্ষিণ স্পেনে (আন্দালুসিয়া) ভূমধ্যসাগরের হাওয়া বয়, জলপাই আর আঙুর ফলে। পূর্ব স্পেন ঘোরতর অনুর্বর, তবু হুড়কো, মানে সেচ আর সার দিয়ে চাষবাস করানো হয় সেখানে, ধানচাষ। আর ভ্যালেন্সিয়ার কমলা, আহা সেতো একেবারে দেবভোগ্য। নদী আছে অনেক কিন্তু নাব্য নদী একটাই, গুয়াদালকুইভির (মহানদী), আন্দালুসিয়ায় বয়ে যায়। গরমে খরা হয়, শীতে তুষারপাত। কয়লা, তামা, দস্তা আছে, তেল নেই। সব রকমই আছে কিন্তু বেচারী স্পেন এতো রকম বৈচিত্র্য সামলে উঠতে হিমসিম খেয়ে যায়। তিনটে উপজাতি

মতো -- বাস্ক, ক্যাটালান আর গিটানো, আর এককালের যাযাবার জিপ্‌সী, বেদের দল। ভাষা নিয়েও অনেক গণ্ডগোল। তারমধ্যে বাস্ক ভাষা তো ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের দুঃস্বপ্নের উৎস, তার চতুর্দিকের ভাষাগোষ্ঠীর -- ইণ্ডো-ইওরোপীয়ান বলা হয় -- কারুর সঙ্গে তার মিল নেই কোনো। ক্যাটালান ভাষা আর স্প্যানিশ ভাষার সম্পর্কটা যে মধুর নয় তা জানা ছিলোনা, প্রসঙ্গটা উঠতে আমাদের স্প্যানিশ গাইড একনিঃশ্বাসে ক্যাটালান ভাষা এবং ভাষীদের পিতৃশ্রাদ্ধ করলেন, তার থেকে বোঝা গেলো কোথাও একটা গোলমাল আছে, মনে হয় নিছক ভাষাবিরোধের থেকে আরো গহীন জলের ব্যাপার॥

**

স্পেন বলতে চট্‌ করে মনে আসবে কলম্বাস, বুলফাইট, আলহাম্‌ব্রা, মাদ্রিদ আর মদিরা শেরী। আর অবশ্যই সমতলনিবদ্ধ ধারাসারকে ঘেরা সেই অমর সঙ্গীত। শেরীসেবনে একটু দ্রবীভূত হয়ে থাকলে মনে আসতে পারে ফ্ল্যামেংকো, পিকাসো, গোইয়া, লরকা, এল্‌ডোরাডো, কন্‌কুইস্তাডোর ইত্যাদি। হেমিংওয়েও যদি মনে না এসে থাকে তাহলে মিগুয়েল সার্ভান্টিস ও তাঁর মানসপুত্র ডন কিহোতের নামটি নিশ্চয় ভুলে বসে আছেন। বলেছিলাম শেরীটা একটু ভারী জিনিষ, রয়েসয়ে খাবেন। ম্যান অফ লা মাঞ্চা বললে কী অজ্ঞান অন্ধকার একটু কমছে? [চিত্র ৩ ও ৪]

এই বেলা চট করে স্পেনের কুলজী-কুষ্ঠীটা একটু নেড়ে চেড়ে দেখা নেওয়া দরকার। আহা অমন বিসদৃশ বিজৃম্ভণ করছেন কেন, নাতিনাতনীরা ভয় পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করবে যে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো কথা যদি না জানতে চান, তাহলে ক্লিক করে এইখানে চলে যান সরাসরি, পরীদের খবরের কাছাকাছি। মনে রাখবেন, শেষে কিন্তু সেই রমেশের মেজমামার দশা হবে, সেই যে মশায় ''. . . সেও ছিল সেয়না/ যত বলি ভালো কথা কানে কিছু নেয় না;--/ তারপর একদিন চান্নির বাজারে/ পড়ে গেল গাড়ি চাপা রাস্তার মাঝারে!'' তখন এই মাথামোটা পোনুকে ডাকতে আসবেন না।

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ। স্পেনের রাজা আছেন, নাম হুয়ান কার্লোস এবং ট্যাবলয়েড-অলঙ্করণ করার পরেও তিনি এবং রাজপরিবার দেশের লোকের ভালোবাসা পেয়ে থাকেন। 'শক-হুণদল পাঠান, মোগল'-এর মতো স্পেনেও বিজয়ীরা এসেছে এবং পদচিহ্ন রেখে গেছে। দুটো বিশ্বযুদ্ধেই স্পেন মোটামুটি গা বাঁচিয়ে চলেছে তাই স্পেনের ওপর তেমন কীর্তিনাশা হামলা হয়নি, অর্থাৎ পুরাকীর্তি বিধ্বংস হয়নি। কালাপাহাড়েরা যথারীতি ছিলেন অবশ্য এবং ছিলেন প্রচুর, তাঁদের কীর্তিকলাপ সহজেই দৃষ্টিগোচর। গোড়ায়, মানে সভ্যতার প্রত্যূষে ফিনিসীয়, গ্রীক আর কার্থেজীয় শাসন চলেছে, শেষমেষ অবশ্যই রোম। চতুর্থ শতাব্দীতে রোম মারফৎ খ্রিষ্টধর্মের দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপন এবং তার পরের শতাব্দীতে রোমসাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার সুযোগে ভিজিগোথদের শাসন -- প্রায় তিনশো বছর লেগেছে এ খেলা সাঙ্গ হতে।

যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন এর মধ্যে ''সাদায় কালোয় দ্বন্দ্ব'' চলেছে। আবহমান কাল থেকে দক্ষিণ স্পেনে বসতি গেড়েছেন উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার কৃষ্ণচর্মেরা (কার্থেজীয়রা বিশেষ করে) আর ক্রমে ক্রমে উত্তর স্পেনে হানা দিয়েছেন কেল্ট প্রমুখ সাদারা। রক্তারক্তির মারামারিটা পরে বিয়েশাদির রক্তহীন কিন্তু প্রাণঘাতী সঙ্ঘাতে পরিণত হয়েছে যথারীতি। তাই স্পেনে, বিশেষত দক্ষিণ স্পেনের চামড়া অল্পবিস্তর বাদামী ঘেঁষা। যাইহোক, ভিজিগোথেরা ঠিক ভিজে বেড়ালটি ছিলেন না, বিশেষ করে স্বজনতাড়নের ব্যাপারে। সেই আভ্যন্তরীণ কলহের ছিদ্রপথে ৭১১ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ থেকে মূরেরা প্রবেশ করেন, দক্ষিণ স্পেন কুক্ষিগত করেন এবং খ্রিস্টানদের উত্তরে তাড়ান। এ ধরণের কাহিনী আমাদের, ভারতীয়দের বেশ ভালোই জানা থাকার কথা, ''বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে''। এই মূরেরা আসলে মুসলমান। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর প্রায় একশো বছর গেছে, ইসলাম তখন ভালোই ছড়িয়েছে, এমনকী আফ্রিকাতেও। মূরেরা উত্তরপশ্চিম আফ্রিকার মরিটানিয়া এবং মরক্কোর বাসিন্দা ছিলেন, তারই থেকে এই নাম। ৭১১ খ্রিস্টাব্দের এই

অভিযানের নায়ক ছিলেন তারিক ইবন জিয়াদ এবং তিনি যে পাহাড়ে এসে নৌকো ভিড়িয়েছিলেন তার নাম দেওয়া হয় জবল (আরবী ভাষায় পাহাড়) তারিক -- আমাদের আজকের জিব্রাল্টার। তারপর মূরেরা প্রায় সাতশো বছর রাজত্ব করেন, তার প্রথমার্ধ বীরদর্পে, শেষার্ধ ভগ্নদূত হয়ে। মূরদের শাসনব্যবস্থা রোমের মতো শক্তিশালী কেন্দ্রভিত্তিক ছিলোনা। ফলং, কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহ, অশান্তি (বেশীটাই নিজেদের মধ্যে -- যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ) চললো, আবার বেশ কিছুকাল শান্তি আর সমৃদ্ধি। মূরদের গুণ ছিলো অনেক -- শিল্পকলা, বিজ্ঞান, স্থাপত্য এমনকী নানা ধরণের প্রযুক্তিতেও উৎসাহী ছিলেন, কাজেই হানাহানিতে বীর্যক্ষয় যদি না করতে হোতো তাহলে ক্রীতদাস-নিপীড়ন, অন্য ধর্মাবলম্বীদের কলমা পড়ানো, গরীব প্রজাদের ওপর অত্যাচার করার ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা এসব চারুকলারও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। দক্ষিণ স্পেনের যে অঞ্চলটির নাম আন্দালুসিয়া, সেখানে তাঁদের দুই ধরণের কীর্তিরই ভালো সাক্ষ্য আছে।

খ্রিশ্চানরা গোড়াতে উত্তরে কোণঠাসা হলেও একেবারে বসে ছিলেন না, সুযোগ পেলেই মূরদের তাড়াবার চেষ্টায় ছিলেন। অবশেষে তাঁরা পনেরোশো শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে গ্রানাডা থেকে শেষ মূর সুলতানকে, নাম বোয়াবদিল, তাড়ালেন, তখন স্পেনের সিংহাসনে খ্যাত এবং কুখ্যাতনামা রাজদম্পতী -- ফার্দিনান্দ আর ইসাবেলা। বোয়াবদিলকে দক্ষিণ স্পেনে নির্বাসনে পাঠানো হয়। গল্প কথা যে সেখানে যাবার পথে বোয়াবদিল একবার দাঁড়িয়ে বিরাট দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছিলেন, গ্রানাডার সেই জায়গা আজও দর্শনীয় এবং তার নাম 'মূরের শেষ দীর্ঘশ্বাস', The Moor's Last Sigh। যাঁরা সল্মন রুশদির এই নামের উপন্যাস পড়েছেন তাঁদের মনে পড়তে পারে যে বোয়াবদিল সেই উপন্যাসের এক প্রধান চরিত্র। [চিত্র ৫]

**

বোয়াবদিল বিতাড়নের পর রাজদম্পতী তাঁদের প্রজাদের খতিয়ান নিয়ে দেখলেন যে গুঁতোর ঠেলায় যদিও অনেক ইহুদী আর মূর মুসলমানেরা খ্রিস্টধর্মপ্রাণ হয়েছেন, কিন্তু সে সবই ওপরে ওপরে, ঘোমটার তলায় খকারাদ্য অশ্লীল নাচের বহর কমেনি। এখন কী উপায়। চিন্তার কিছু নেই, ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ চতুর্থ সিক্সটাস আগে থেকেই সব কলকাঠির ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তার নাম হোলো 'তদন্ত', inquisition। চাই কেবল সেগুলো নাড়া দেবার লোক। একেবারে বাঘের ঘর থেকেই ঘোগ সংগ্রহ করা গেলো, রাণীর পাপস্বীকারের একান্ত সচিব, father confessiomal, নাম টর্কমাডা, Tomas de Torquemada, এবং তিনি যে ঘটনার নায়কত্ব নিলেন তার নাম হোলো স্প্যানিশ ইন্কুইজিশান। প্রথম, টর্কমাডার উপলব্ধি হোলো যে শুধু কথায় বা কাজে নয়, অন্তরের অন্তস্তলে যীশুপ্রীতি যদি না থাকে কারোর, তাহলে নির্দ্বিধায় তাকে অবিশ্বাসী, হেরেটিক, বলা যায়। এখন কার মনে কী আছে তা বার করা সহজ নয়, যতক্ষণ সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিশ্ববাসীকে না জানাচ্ছে। তখন অনেক কঠিন অঙ্ক কষে টর্কমাডা এই অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছে ভুতুড়ি বার করার কল বার করলেন -- যেমন পা বেঁধে উল্টোবাগে ঝুলিয়ে দিলে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পেট থেকে সব পাপ বেরিয়ে আসে; তার ওপর যদি একটু সেঁক দেওয়া যায় তাহলে তো আর কথাই নেই। তারপর ছুপে ইহুদী আর ছুপে মুসলমানদের ওপর এসব প্রযুক্তি উদার হস্তে প্রয়োগ করে বহু তথ্য সংগ্রহ করলেন ও তা লিপিবদ্ধ করে গেলেন। টর্কমাডার গবেষণা এতোই মর্মস্পর্শী হোতো যে স্বয়ং পোপ সিক্সটাস (আচ্ছা, এর নাম শুনলেই একে জুতো মারবার অদম্য ইচ্ছে হয় কিনা বলুন তো) বলেছিলেন, ওহে, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে। তাতে অবশ্য টর্কমাডা থামেননি, তিনি গুরুমারা চ্যালা। একথা মনে রাখবেন যে আজকের দিনে সন্ত্রাসবাদীদের পেট থেকে খবর বার করতে যে সব যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, যথা ওয়াটারবোর্ডিং, তার অনেকগুলোই এই টর্কমাডার মৌলিক গবেষণার ফল। কট্টর ক্যাথলিকেরা অবশ্য বলেন যে টর্কমাডার ওপর অবিচার করা হচ্ছে, আসলে ''বাবু যত কন, পারিষদগণ...'' ইত্যাদি, টর্কমাডার কল্যাণে দেশে তখন মিথ্যাচার বন্ধ হয়েছিলো, শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, ব্লা, ব্লা। তবে টর্কমাডার কল্যাণে স্প্যানিশ ক্যাথলিক গির্জার রত্নকোষে যে স্বর্ণবৃষ্টি হয়েছিলো, সেকথা তো আর উড়িয়ে দেওয়া যাবেনা -- পরে সেভিলপর্ব পশ্য।

হিটলারও ইহুদীদমনে টর্কমাডার থেকে কিছু ধার নিয়েছিলেন , তা সেটা তাঁরা মানুন আর না মানুন। [চিত্র ৬]

প্রজাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলবিধানের পর স্পেনের শাসকেরা নজর ফেরালেন নিজেদের আধিভৌতিক উন্নতির দিকে -- তখনকার কালে যার প্রধান উপাদান ছিলো সোনা আর রূপো। স্পেন, বিশেষ করে স্পেন, তখন রাজন্যবর্গ আর অভিজাতদের কৃপার বন্যায় এবং ডাকাবুকো সব পর্যটকদের সাহায্যে পৃথিবী জয়ে বেরলো -- উদ্দেশ্য অর্থ, খ্যাতি, নিখরচার ক্রীতদাস, রাজ্যবিস্তার এবং, ঠিকই ধরেছেন, প্রভু যীশুর সুসমাচার প্রচার। আধিদৈবিক ব্যাপারটাই বা বাদ যায় কেন – ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ। সঙ্গে পড়ে পাওয়া চোদ্দোআনা -- প্রায় নিখরচায় কী করে জাতিকে জাতি, উপজাতিকে উপজাতি, সভ্যতাকে সভ্যতা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায় তার কৌশল। এই শিক্ষা পরে অনেক কাজে লেগেছে, সেতো আর অস্বীকার করতে পারবেননা। বিশেষ করে স্পেন বললাম কেননা যে সব পর্যটকদের অন্য রাজারা পাত্তা দিতেন না -- যথা ইতালীয় কলম্বাস, পর্তুগিজ ম্যাজেলান – – স্পেন তাদের সাহায্য করতো। আহ্লাদ করে এই দস্যুদের -- জল এবং স্থল -- ডাকা হোতো বিজয়ী, কন্‌কুইস্তাডোর বলে। এসব প্রাতঃস্মরণীয়দের নামের তালিকায় একবার চোখ বুলিয়ে দেখুন, পঞ্চকন্যাস্মরণের মতো মহাপাতকনাশক এই লিস্ট। ম্যাজেলান আর কলম্বাস তো আগেই বলেছি। ম্যাজেলান না থাকলে পৃথিবী যে গোল তা জানা যেতো না, ফলে অনেকে না জেনে ন্যাড়া ছাতের মতো চ্যাপ্টা পৃথিবীর ধার দিয়ে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারাতেন। আর কলম্বাস -- ওরে বাবা সে তো অকল্পনীয়, বছরে ছুটির দিন একটি যেতো কমে, ওহায়োতে আপনার নর্মভূমির কী হোতো মশাই, এমনিতরো আরো কত কী। বাকী তালিকা -- না ঘটলে কী ঘটতো তার হিসেব আপনাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি -- বালবোয়া, পিজারো, কর্টেজ, করোনাডো, দে সোটো, পঁস দে লিওন, . . . । ভেবে দেখুন দক্ষিণ আমেরিকায় নিদারুণ ভাষাসঙ্কট, উত্তর আমেরিকায় বেআইনি অথচ সস্তা মেক্সিকান শ্রমিকের অভাব, মাচু পিচু দর্শন করিয়ে যাঁরা আজ জীবনধারণ করেন তাঁদের দুরবস্থা -- আর ভাবা যাচ্ছে না স্যার, অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি [চিত্র ২]।

এঁদের কৃপায় স্পেনে তখন স্বর্ণ যুগ। হ্যাবস্‌বার্গ বংশ সিংহাসনে আসীন, এবং উড়ন্ত। তারপর কী হোলো বলুন তো? য়্যাই, যা বলেছেন, অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অর্থাৎ পতন। স্প্যানিশ আর্মাডার ব্যাপার নিশ্চয় ইস্কুলপাঠ্য ইতিহাসে পড়েছেন, অবশ্য আমাদের প্রভু ইংরেজদের মহান কীর্তি হিসেবে। তারপর যেমনটি হবার কথা, লঙ্কায় অন্যজনেরা, বর্বোন বংশ, এসে রাবণত্ব লাভ করে দেশকে উচ্ছন্নে নিয়ে গেলেন। এদিকে পাশেই নেপোলিয়ান বসে যে নেহাৎই আঙুল চুষছিলেন, তা নয়, নানা ছলছুতোয় স্পেনের কিছুটা অন্তত কুক্ষিগত করলেন, তারপর, ইতিহাসের মোটামুটি অমোঘ আইনে গোহারান হেরে গেলেন। ইতিহাসের নাগরদোলা থেকে স্পেনের আর নামা হোলো না।রাজা এলো, রাজা গেলো, রাণী এলো, রাণী গেলো, রিপাবলিক হোলো, গেলো, ইতিমধ্যে ভাঁড়ে বাসা বাঁধলেন মা ভবানী। তারপরে আবার উত্তর আমেরিকার ঔপনিবেশিকদের ব্রিটিশ অধিকার নস্যাৎ করে স্বাধীন হবার দৃষ্টান্ত থেকে বল পেয়ে ভেনেজুয়েলা, প্যারাগুয়ে, পেরু, ইকুয়েডর, মেক্সিকো সবাই স্বাধীন হতে চাইলো এবং হোলো। এসবই ছিলো স্পেনের উপনিবেশ, ভাতকাপড়ের জোগানদার। শেষ কোপটি পড়লো যখন স্পেন আমাদের আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে হেরে কিউবা ছেড়ে দিতে বাধ্য হোলো, ফিলিপিনও গেলো কিছুদিন পর। মনে রাখার মতো একটা কথা হোলো যে এই দুর্যোগের কালেও ইতিহাস স্পেনকে একটি ব্যাপারে করুণা দেখালেন -- শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য এবং অন্যান্য চারুকলার ক্ষেত্রে স্পেনের প্রতিপত্তির প্রবেশ, প্রকাশ আর প্রসার রইলো মোটামুটি অব্যাহত। আজকের দিনের স্পেনপর্যটকদের পথশ্রম সার্থক করার জন্য তার অনেক কিছুই আজও দেখা যায়।

বিংশ শতাব্দীতে আরো মজা, খেলায় নামলেন বাম এবং দক্ষিণপন্থীরা। প্রথম মহাযুদ্ধে স্পেন গা বাঁচিয়ে চললো। রাজা গেলেন, জঙ্গী শাসন হোলো, তারা গেলো, এলো সোস্যালিস্টরা, এসে স্প্যানিয়ার্ডদের জীবন থেকে মধ্যযুগীয় কিছু চিন্তা–ধারণা বাদ দেবার, কিছু প্রথা–রীতি বদলাবার চেষ্টা করলেন। যথা, শিক্ষা আর রাজনীতির ক্ষেত্রে চার্চের ক্ষমতা কমানো। স্প্যানিয়ার্ডরা ক্যাথলিক

এবং একটু বাড়াবাড়ি রকমের ধর্মভীরু, রাজনীতির অঙ্গনে এমন মাৎস্যন্যায় দেখে তাঁরা ধর্মকে আরো আঁকড়ে ধরতে চাইলেন, ফলে ফ্যাসিজম ছুঁইছুঁই দক্ষিণপন্থীরা আস্ফালন করলেন বছর দুয়েক তারপর ১৯৩৬ সাল থেকে শুরু হোলো সব পাপের সেরা পাপ -- গৃহযুদ্ধ, বাপে-ছেলেতে, ভায়ে-ভায়ে, বন্ধুতে-বন্ধুতে। এ যুদ্ধে কেউ কখনো জয়ী হয় না, স্পেনও হোলোনা। জার্মানী তখন হিটলারের বিষে নীলকণ্ঠ, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড সবাই গা বাঁচাতে ব্যস্ত, তার মধ্যে জার্মানী এসে গুয়ের্নিকাতে বোমা ফেলার মহড়া দিয়ে গেলো, গোদের ওপর বিষফোড়া। গুয়ের্নিকার ঘটনা পাবলো পিকাসোর বিশ্বখ্যাত গুয়ের্নিকা ছবিতে ধরা আছে, দেশকাল অতিক্রম করে তা আজ যুদ্ধের, যে কোনো যুদ্ধের বীভৎসতার অতি জীবন্ত প্রতীক ছবি। ১১ ফুট লম্বা আর ২৩ ফুট চওড়া এই মুরালের বাসা মাদ্রিদের সোফিয়া রেইনা যাদুঘরে। আমার মূর্খামির জন্য এবার সামনাসমনি দাঁড়িয়ে ছবিটা দেখা হোলো না। স্মৃতিকে গুঁতো মারার জন্য ওয়েবে এখানে ছবিটা একবার দেখে নিতে পারেন। (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/74/PicassoGuernica.jpg) প্রসঙ্গত, নিউ ইয়র্কের ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রবেশপথে গুয়ের্নিকার আরেকটি সংস্করণ রাখা আছে। সেই ছবি, আমাদের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারি কলিন পাওয়েল, আর এক ফড়ে জন নেগ্রোপন্টে এবং ইরাকের বর্তমান ধর্মযুদ্ধে ''সবারে করি আহ্বান''-এর ব্যাপার নিয়ে এক মজার গল্প চালু আছে, এখানে পড়ে দেখতে পারেন। (http://en.wikipedia.org/wiki/Guernica_(painting)#Guernica_at_the_United_Nations)

অবশেষে ১৯৩৯ সালের পয়লা এপ্রিলে (এবছর স্পেনে অন্তত এপ্রিল ফুল্‌স্‌ ডে মুলতুবি ছিলো) দুপক্ষে সন্ধি হোলো এবং রাজদণ্ড তুলে নিলেন বিরোধী (জাতীয়তাবাদী, ন্যাশনালিস্ট) পক্ষের নেতা এক মধ্যবয়সী সৈন্যাধ্যক্ষ, নাম ফ্র্যাঙ্কো, জেনারেল ফ্রান্‌সিস্‌কো ফ্র্যাঙ্কো। এতো খেটেখুটে ক্ষমতা পেয়ে ফ্র্যাঙ্কো অবশ্যই একনায়ক হয়ে বেশ মৌরসী করে বসলেন এবং ১৯৭৫ সালে তিরাশি বছর বয়সে গতাসু হওয়া পর্যন্ত নিরঙ্কুশ রাজত্ব করে গেলেন। ফ্র্যাঙ্কো সায়েব বুদ্ধিমান, ঘুঘু বলা যায়, স্পেনকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফাঁস থেকে বাঁচালেন বটে, কিন্তু মানুষটা ছিলেন একটু বদ্‌মেজাজী। দেশের লোকেদের সবাইকে জানালেন যে তিনি স্পেনের ঈশ্বরপ্রেরিত নেতা, এমনকী ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এই বচন আবৃত্তিতে বাধ্য করলেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যখন কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য দুর্বৃত্তরা তাঁর অবাধ্য হোলো তখন তিনি একুশে আইন মতে তাদের সিধে করার ব্যবস্থা করলেন। নাচ, গান, হৈ হৈ করা, সাহিত্য, কবিতা ইত্যাদি ইয়ার্কি বন্ধ করলেন, প্রায় চল্লিশ বছর স্পেন রামগরুড়ের ছানা হয়ে কাটালো। হবি তো হ, ঠিক সেই সময়েই পর্তুগালেও আরেক ধুরন্ধর পর্তুগালের ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসে আছেন, নাম সালাজার -- ক্রমশ প্রকাশ্য। যাবার আগে শেষ রাজার নাতি হুয়ান কার্লোসকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ফ্র্যাঙ্কো একটি মহৎ কাজ করে গিয়েছিলেন,। সে আবার যে সে মনোনয়ন নয়, রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠাকরণ। হুয়ান কার্লোস দেখা গেলো দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, প্রজাহিতার্থে গণতন্ত্র চালু করলেন এবং এখনো তাই চালু আছে। স্পেনের লোকেরা আবার নাচছে, গাইছে, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে যোগ দিয়ে মাথা চুলকাচ্ছে, ঘুষঘাষ নিচ্ছে, পরস্পরকে কাঠি দিচ্ছে আর পকেটভারী পর্যটকদের জন্য দরজা হাট করে খুলে দিয়ে তাদের নানান ভাবে টুপি পরাচ্ছে। সভ্য ভাষায় স্ন্যাফু snafu।

**

মাদ্রিদ স্পেনের রাজধানী, প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর হতে চললো স্পেনের রাজধানী। এই মাপের রাজধানীতে যা আশা করা যায় তার প্রায় সবই আছে মাদ্রিদে। লোকজন, গাড়ীঘোড়া, রাজা, তাঁর ধানী (২৮০০ ঘর), রাজসভা, মন্ত্রীসভা, নতুন নতুন বিরাট বিরাট বাড়ী, বয়োভারে মহীয়ান কিন্তু নতুন পলেস্তারার চমক লাগানো পুরনো বাড়ী -- স্থাপত্যনিদর্শনের রাজভোজ। গাড়ীগুলো অপেক্ষাকৃত অচেনা মার্কা -- ইউরোপীয়ান গাড়ী, দুয়েকটা ব্র্যাণ্ড ছাড়া আমাদের কাছে বিশেষ পাত্তা পায় না। আমরা চ্যাপ্টা নাকের গুণগ্রাহী। রাস্তাঘাট এদেশের তুলনায় একটু রোগারোগা মনে হোলো, তা আমরা তো মশাই গড্‌জিল্লার যাতায়াতের মাপে রাস্তা তৈরী করি, কে জানে ''যদি আমায় পড়ে তাহার মনে''। আলো ঝলমল দোকান, ঠেলাঠেলি ভীড়ের রেস্টুরেণ্ট, গাঁটকাটা,

পকেটমার -- কী নেই। ''কেবল পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া. . .'' না সে কথা অন্যত্র। গির্জের শেষ নেই। আগেই বলেছি স্প্যানিয়ার্ডরা রোমান ক্যাথলিক, -- গির্জে, ধর্মানুষ্ঠান এবং আনুষঙ্গিক বাহ্যাড়ম্বরে তাদের অরুচি নেই। আর তল্লাটে যথেষ্ট বালক আর কিশোর পাওয়া গেলে পুরুত পাবার সমস্যাও নেই কোনো। সন্তেরও কোনো শেষ নেই আর আজ এই সন্তের দিন, কাল ঐ সন্তের দিন -- এ লেগেই আছে স্প্যানিয়ার্ডদের ফূর্তি করার জন্য। সব কটাতে আপিস কাছারি বন্ধ করা যায় না নিশ্চয়, বোধহয় ''ফ্লোটিং হলিডে'' দিয়ে সব ম্যানেজ হয়।

ছেলেবেলায় রথের আর চড়কের মেলায় তেঠ্যাঙা এক বাক্স, তাতে খোপ খোপ কাটা, কাঁচ দিয়ে এবং কাঁচের ওপর পেতলের ঢাকনা দিয়ে ঢাকা এক যন্ত্রের দেখা পাওয়া যেতো। ফেরিওয়ালা তারস্বরে চেঁচাতো '' আগ্রাকে তাজ দেখো, লান্ডান কে বিরিজ দেখো . . .'' এই ধরণের লম্বা লিস্টি। পাঁপড়ের এক আনা বা দু আনা সমর্পণ করে আমরা কাঁচের ফোকরে চোখ লাগাতাম, ফেরিওয়ালা হাতল ঘোরাতো, কী দেখছি কী দেখছি না তা বোঝবার আগেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যেতো আর আমরা বাইস্কোপ দেখে খুসি হযে বাড়ী ফিরতাম। কুণ্ডু স্পেশ্যালে তারই অনুকরণে ''প্যানোরামিক সিটি ট্যুর'' – এ নিয়ে যাওয়া হয়। ভ্যানে বা বাসে উঠে আমরা সবাই একসঙ্গে কথা বলি আর সামনের সীট থেকে গাইড বলে ''ডানদিকের জানলা দিয়ে দেখলে যে চত্বরটি দেখবে সেখানে বসে আর্ণেস্ট হেমিংওয়ে মাল খেতেন'', কিংবা ''সামনে বাঁদিকে ঐ চাকা মতো যা দেখতে পাচ্ছো সেখানে অবিশ্বাসী, হেরেটিকদের হাড়গোড় ভাঙা হোতো'', অথবা, আরো মর্মঘাতী, ''সামনেই স্পেনের রাজপ্রাসাদ, কেবল পাঁচমিনিটের মতো থামা হবে ছবি তোলার জন্য, ব্যস, এবারে কিন্তু আর এর বেশী হবে না''। এভাবে কীই বা দেখা যায়। আমাদের দলে ক্যামেরাবৃত চারজন ছিলেন। তার মধ্যে ক্যামেরাধারিণী একেবারেই এলেবেলে, তাঁর তোলা ছবিতে এই দেখি ফ্ল্যাশ জ্বলেনা, আবার ফ্ল্যাশ জ্বললো তো বুড়োআঙুলের ছবি উঠে গেলো -- সেই ''গোরুতে ঘাস খায়'' ছবির মতো, ঘাস নেই কারণ গোরুতে তা খেয়ে গেছে, আর গোরু নেই কেননা সে ঘাস খেয়ে চলে গেছে। আর তিনজনের গলায় যে সব যন্ত্রপাতি ঝোলে তাদের চেহারা খানদানী এবং খেতাব গালভরা। তার মধ্যে একজন একটু পুরনোপন্থী, ধীরেসুস্থে সব কাজ শুরু করেন, শেষ করেন কীনা জানা নেই, গতবছরের গ্রীসভ্রমণের ছবি আমরা আজও দেখলাম না। দ্বিতীয়জন চলচ্চিত্রের পৃষ্ঠপোষক, সুন্দরীদের ফ্ল্যামেঙ্কো নাচের ছবি আবার তাঁর ক্যামেরা মারফৎ দেখবো, এই আশায় দুগেলাস মদিরা সেবন করালাম। এখন দেখছি তাঁর তোলা ছবি ''অব্যক্তোহয়ম্ অচিন্ত্যোহয়ম্'', ইন্দ্রিয়াদির অগোচর এবং চিন্তার অতীত। কম্প্যুটার লিঙ্গোতে বললে write-only memory। আপনার মতো মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারদের এ রহস্যভেদ করতে কষ্ট হবে জানি, তবু একটু চেষ্টা করবেন। read-only memory–র কথা ভাবুন -- যে কম্প্যুটার মেমারি পড়া যায় কিন্তু লেখা যায় না -- তারই ছোটো ভাই আর কী। তৃতীয়জন ধারে কাটেন না, ভারে কাটেন, হাজার খানেক ছবি দরজার সামনে উপুড় করে নিপাত্তা, কোনটা কিসের ছবি শুধালে কর্তা গিন্নির দিকে দেখান, গিন্নি কর্তার দিকে আর বেলা বয়ে যায়।

গির্জের পরেই যদি কিছু স্প্যানিয়ার্ডদের পছন্দ থাকে(অবশ্যই শুঁড়িখানা বাদ দিয়ে) তা হোলো প্লাজা। এর জুৎসই বাংলা প্রতিশব্দ পাচ্ছিনা -- অঙ্গনটা বড়ো ব্যক্তিগত, বটতলা বা চণ্ডীমণ্ডপ ব্যবহারের দিকে কাছাকাছি এলেও মাপে খাটো। হাট বা বাজারের সঙ্গে বটতলা যোগ দিলে হয়তো কিছুটা বোঝানো যায়। প্লাজা ব্যাপারটা হোলো শহরের মধ্যে চারদিকে বাড়ী ঘেরা এক বিরাট মাঠ, ইঁট বা পাথর দিয়ে বাঁধানো। সেখানে লোকে জমায়েৎ হয়, আড্ডা মারে, আমরা গড়িয়াহাট মোড়ে যে যে কারণে যেতাম। চায়ের, থুড়ি কফির দোকান আছে, এই একজন চটপট আপনার ছবি এঁকে ফেললো, জিপ্সিরা আপনার হাত দেখবে, পকেট মারবে। বিরাট তফাৎটা এইখানে যে প্লাজাতে সাঙ্ঘাতিক সাঙ্ঘাতিক সব জনরঞ্জনী ব্যাপারও হতো -- যথা ষাঁড়ের লড়াই বা স্প্যানিশ ইন্‌কুইজিশনের কৃপায় জ্যান্ত পাপীর দীর্ঘ দণ্ড প্রদানের মতো নাটকীয় দৃশ্য, চাই কী দুয়েকটা জয় মা ঘ্যাচাং -- এবং সেই দৃশ্য দেখিয়ে নাগরিকচিত্তে যুগপৎ উদ্দাম পুলক এবং উৎকণ্ঠ শঙ্কার সঞ্চার। চতুর্দিকের বাড়ীর বারান্দা থেকে পরিজনপরিবেষ্টিত হয়ে সুধাসেবনের সঙ্গে সঙ্গে এসব ব্যাপার বেজায় জমতো নিশ্চয়, বিশেষত টেলিভিশনের আগের যুগে। এখন অতো রোমহর্ষক ব্যাপার

হয়না, তবে এখনো নানান মেলা আর উৎসব (আগেই বলেছি স্পেনে সন্তের অভাব নেই, অভাব নেই সন্তোৎসবের) , যাত্রা, বাজি পোড়ানো এবং অবশ্যই রাজনৈতিক সভা। মাদ্রিদে এমনতরো প্লাজা অনেক, আমরা যেটায় গিয়েছিলাম তার নাম প্লাজা মেয়র -- অর্থাৎ প্লাজা মেজর, প্রধান প্লাজা। এক লাখ লোক ধরে বলে জানা গেলো -- তার কতো চত্বরে আর কতো চতুর্দিকের বিস্তৃত বারান্দায় (দস্তুরমতো টিকিট বিক্রি হয় বলে শুনলাম) তা জানিনা। চারদিকের ঘেরা বাড়ীর গায়ে সুন্দর সব মুরাল আঁকা। আসলে বাড়ীগুলো ফ্ল্যাটবাড়ী, ভাড়াটে থাকা যায়, তবে প্লাজার দিকে প্রায় সব জানলাই দেখলাম বন্ধ। পাথরচাপা কপাল বুঝলেন না। এইখানে নাকী সন্ত ইসিদ্রোর মোক্ষলাভ -- ঠিক তা নয়, ইংরেজী beatification, বাংলা প্রতিশব্দ হাতের কাছে পাচ্ছি না -- হয়েছিলো। মধ্যিখানে রাজা তৃতীয় ফিলিপের মূর্তি আছে। কফির দোকানে বসে ট্যাপাস সহযোগে কফি খেতে খেতে ভীড় দেখতে খুব খারাপ লাগবে না, ট্যাঁক সামলে হাতটাও গুণিয়ে নেওয়া যেতে পারে। আসল স্পেনবাসীরা অবশ্য মজা মারতে যায় পুয়ের্তা দেল সল প্লাজাতে, আর বোকা টুরিস্টদের পাঠানো হয় প্লাজা মেয়রে। তা কী আর করা যাবে। [চিত্র ৮]

সাগরসঙ্গমে যেতে গেলে পুরুষ্টু ল্যাজের এক মৈত্রমহাশয় চাই, যাত্রাকালে পাপপুণ্যের টানাটানিতে খুঁটি, টাগ অব ওয়ারের এ্যাঙ্কার। তাছাড়া পুলিশ-টুলিশ এলে এগিয়ে দেবার জন্যও তো একজন গেরেস্তারী কাউকে চাই। তা ছোটো কুণ্ডু অতোটা না পারলেও ফ্রীতে আমাদের এক দাদা জুগিয়েছিলেন। দাদার চলন নিঃত্বরা, আশু নস্যপ্রযুক্ত নাসিকার সুখে নেত্র সজল, দৃষ্টি সর্বব্যাপী এবং বচন অমৃতময়। আগের জন্মে দাদা নিশ্চয় কারুর বাজার সরকার ছিলেন। কেননা এজন্মে দেখি নতুন কোনো জায়গায় নেমেই, আশু প্রয়োজনীয় কৃত্য সেরে দাদা যাত্রা করেন দামের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তেন, অমূল্য খবর নিয়ে আসতেন আমাদের জন্য -- ও মশাই শুনছেন পোটাটো চিপ্স চোদ্দো আনা, বোতলের জল পাঁচসিকে, একী মগের মুল্লুক নাকী -- এই সব আর কী। নাদ্রিদের এই প্লাজা মেয়রে দাদা নজরটা একটু উঁচু করেছিলেন, এবং একেবারে কাৎ -- ও মশাই এখানে কণ্ডোমিনিয়ামের দাম যে তিনশো হাজার ইউরো, য়্যাঁ ? দাদার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেলো। যতোই বোঝাই যে দাদা নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটনেও এইরকমই হয়, বেশী হলেও হতে পারে। হাজার হোক মাদ্রিদ তো এদের রাজধানী, এ জায়গাটাকে তো এদের সেন্ট্রাল পার্ক বলা যায়। আস্পর্ধা আমাদের, যতোই বোঝাই, মনেপ্রাণে মার্কিন দাদা বোঝেননা কিছুতে, ছোটো জাতের এই বাড়াবাড়ি দাদার সহ্য হয়না কিছুতে। পরদিন আবার কলাতে মুলোতে ফেরৎ এনে দাদাকে ঠাণ্ডা করা গেলো, বোধহয় বৌদির কিছু হাত ছিলো এব্যাপারে।

**

খাদ্যে রুচি বা অরুচি ব্যাপারটার অনেকটাই অর্জিত, acquired বলা যায়। সে কারণে স্পেনের ডাকসাইটে যেসব খাবার পাওয়া যায় তার কিছু কিছু মোটেই ভালো লাগলো না।

আইবেরিয়ার জারানো হ্যাম, Iberian Cured Ham হোলো এক বিরাট ব্যাপার, এর মধ্যে আবার সেই শহীদ শুয়োর যদি ওকবৃক্ষের ফল খেয়ে থাকে তাহলে তো কথাই নেই। অনেকটা ইটালিয়ান প্রশুইটো হ্যামের মতো। এক থেকে তিনবছর লাগে এই মাংস জারাতে, কিছু হ্যামের দাম দেখছি পাউণ্ডপিছু পঞ্চাশ ডলার ছুঁচ্ছে। । একে আবার সসেজ বানিয়েও বেচা হয়, তখন তার নাম চোরিজার, chorizar। সর্বঘটে স্যালাডের মতো দুয়েক প্লেট এই হ্যাম বা সসেজ সব ভোজনেই হাজির থাকে দেখলাম। খেলাম, কিন্তু ঐ যে বলেনা, 'চরণামৃত কী যে অমৃত, খেয়ে দেখি কিনা জল'! রাস্তায় যতো পানালয় আর ভোজনালয় (বিশেষ করে পানালয়) দেখলাম তার সবেতেই দেখি ঘরের ছাতে এই হ্যামের ঠ্যাং ঝুলছে, অনেকটা এইমতো দেখতে। [চিত্র ৯] আমাদের মনে হতে পারে কসাইখানার সামনে বসে খাচ্ছি, কিন্তু সায়েবদের গায়ে লাগেনা। ট্যাপাস বলে একটা ব্যাপার আছে, সেটা হোলো চেখে দেখার সাইজে নানান ভোজ্যের মিছিল যেমন-- রুটি, স্যালাদ, অমলেট, শামুক ভাজা, চিংড়ি, আলু ছেঁচকি, জলপাই, শুঁটকি মাছ, আচার, অন্যান্য আরো সব অখাদ্য এবং অবশ্যই জারানো হ্যাম এবং চিরিজো। ।ইটালিয়ানরা খায় আন্টিপাস্তো, চীনেরা ডিম

সাম, ফরাসীরা অর দ্যর্ভ্ আর এরা ট্যাপাস। ট্যাপাসের উৎপত্তি নিয়ে কিছু গল্পকথা আছে, তার একটি হোলো যে কাদিজ প্রদেশে রাজা দশম আল্ফন্সোর তৃষ্ণানিবারণের শেরিতে যাতে বায়ুতাড়িত ধুলো না পড়ে তাই হ্যাম(অবশ্যই পঞ্চাশ পাউণ্ডি হ্যাম) ঢেকে দেয়া হয়েছিলো, বুড়ো বারবার তা চেয়ে চেয়ে খান (হ্যামে গাঁজা ফোড়ন ছিলো কীনা ইতিহাস সে বিষয়ে নিরুত্তর)। ঢাকা অর্থাৎ আচ্ছাদনের নাম ট্যাপা তারই থেকে ট্যাপাস। টপাস টপাস করে খাওয়া যায় বলে এমন নাম হতে পারে কীনা একটু ভেবে দেখবেন। ট্যাপাস ভক্ষণ হচ্ছে সান্ধ্য শুঁড়িখানা ভ্রমণের অঙ্গবিশেষ, রসিকে বলে যে ট্যাপাসের মুখ্য প্রয়োজন হোলো এ শুঁড়িখানা থেকে ও শুঁড়িখানা যাবার শক্তির জোগান দেওয়া। আমেরিকাতেও আজকাল ট্যাপাস বার চালু হচ্ছে, বিশেষ করে পশ্চিমে।

স্পেনের আরেকটা ডাকসাইটে খানা হচ্ছে পায়েয়া, paella, বিরিয়ানির অতি গরীব ভায়রাভাই। ভাতই আসল, তারপর জলপাইয়ের তেল, নানান সামুদ্রিক প্রাণী, মাংসও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, বিলিতি বেগুন, পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি অব্রাহ্মণোচিত উপকরণ এবং জাফরান -- সব একসঙ্গে সেদ্ধ। মধ্যাভাবে গুড়ম্। তবে নানা রকম কায়দা করে সাজিয়ে দেয় বটে, টলেডোতে এক পায়েয়ার দোকানে ঢুকে সবাই মিলে চারপাঁচরকম পায়েয়া এনে চেখে দেখা গেলো, খারাপ নয়, ভালোই, অন্তত ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যায়। [চিত্র ৭] আমাদের কুণ্ডু স্পেশ্যাল হোটেলে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল ভালোই, তবে সেসবই টুরিস্ট হোটেল, পাত পেতে, পরিবেশিত হয়ে খাওয়া নয়, ঢালাও থালা থেকে তুলে তুলে খাওয়া, ইংরেজীতে যাকে বলে buffet। পেট ভরে কিন্তু মন ভরে না, জিভের জলও ঝরে না। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, সব জায়গাতেই মিষ্টির, অর্থাৎ কেক-পেস্ট্রির টেবিলটা বেশ প্রমাণ সাইজের, মিষ্টির চেহারাও বেশ মনোহর। ফলম্ ট্যুর শুরু করলাম নেয়াপাতি নিয়ে, ট্যুর শেষ হোলো যখন তখন ঝুনো ডাব! তবে কী জানেন, যতোই শুয়োরকে ফল খাওয়াক আর পোলাওতে জাফরান দিক, ইটালিয়ান আর ফরাসী রন্ধনশিল্পের সঙ্গে রূপে-বর্ণে-স্বাদে-গন্ধে তুলনা করলে এরা নেহাৎই ''ফ্যান্তাফ্যাচাং তরকারি''।

**

হোলি টোলিডো, Holy Toledo, নিশ্চয় শুনেছেন, যথা ''হোলি টোলিডো ব্যাটম্যান, জর্জ ডব্ল্যু বুশ বোধহয় আবার জিতে গেলো!'' আর আপনার হাঁ করা ঘষা পয়সা জীবনে বলেছেনও বোধহয় কিছুবার। এ হোলো সেই টোলিডো। এ নিয়ে অনেক গালগল্প চালু আছে। একটা হোলো এই যে একাদশ শতাব্দীতে মুসলমান মুরদের তাড়াবার পর খ্রিস্টানরা টোলিডোকেই মহাতীর্থ বলে মানতে শুরু করে, গির্জা-টির্জা বানায় অনেক, এমনকী একসময় সারা স্পেনের আর্চবিশপ এখানে অধিষ্ঠান করতেন। রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা কোথায় এবং কেন ভীড় করতেন তা আগেই উল্লেখ করেছি তাই আর বললাম না, কিন্তু পুণ্যের এই ঘোর সমাবেশের কারণে টোলিডোকে পবিত্র টোলিডো বলা শুরু হোলো। আমাদের ওহায়োতেও এক টোলেডো আছে, অনেকে বলে যে হোলি টোলিডোর টোলিডোটি হোলো এই ওহায়োর টোলিডো। এই টোলিডোতে, কিছু না হোক, গির্জের ছড়াছড়ি, এখানে (http://www.churchangel.com/WEBOH/toledo.htm) দেখতে পারেন, কিন্তু দুষ্ট লোকে বলে যে প্রায় প্রতিটি গির্জার গায়ে গায়েই একটি শৌণ্ডিকালয় আছে, এটার থেকে বেরিয়ে ওটাতে ঢুকলেই চলে, এবং এই অবস্থানগুণেই টোলিডো পবিত্র। আরেক কহিনী বলে যে টোলিডোর লোকেরা এতোই ধর্মপ্রাণ যে সেখানে কৌতুক-ভাঁড়ামি-সঙের তামাশা (এদেশে ভডেভিল vaudeville বলে) একেবারেই কল্কে পায় না, সিনেমা থিয়েটার সবসময়েই বড়োদিনের পবিত্র সপ্তাহের মতো ফাঁকা, তাই হোলি টোলিডো।

মাদ্রিদ থেকে টোলিডোর দূরত্ব পঞ্চাশ মাইলেরও কম তাই কুণ্ডু স্পেশ্যাল সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসার ব্যবস্থা করেছিলো। ঐ বাইস্কোপের ব্যাপার। টোলিডোর ভৌগোলিক অবস্থান বেশ চমকপ্রদ -- শহরটা একটা টিলার ওপর, তিনদিক ঘিরে ট্যাগাস নদী, Rio Tagus, আবার তার দুধার ঘেঁষে পাহাড়। বলুন দেখি রোমানরা যখন প্রথম এই জায়গা দেখলো, তাদের কী মনে এলো? য়্যাই, ঠিক ধরেছেন, চড়া দেও এক বুর্জ। তারপর ভিজিগথরা এলো, মুররা এলো, খ্রিস্টানরা এলো

-- সবায়ের এই একই সিদ্ধান্ত, দুর্গ বানাও বা সারাই করো। সেই হুজুগে তৈরী হোলো আল্‌কাজার -- আরবী ভাষায কাজার মানে দুর্গ। এই ছবিতে দেখুন [চিত্র ১১] ট্যাগাস নদীর সেতু থেকে টোলিডোর দৃশ্য -- আল্‌কাজার দেখতে পাচ্ছেন তো, ভুল হবার কোনো সুযোগ নেই। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় গোলাগুলি আর বোমা ছোঁড়াছুড়ি ইত্যাদি যতো অশাস্ত্রীয় ঘটনার ফলে আল্‌কাজারের অনেক ক্ষতি হয়। পরে ফ্র্যাঙ্কোর সরকার সেসব সারাই করে আল্‌কাজারকে জাতীয় সম্পত্তি ঘোষণা করে। তবে বেল পাকলে কাগের কী, আমরা যখন গেলাম তখন আল্‌কাজারে ঘষামাজা চলছে, সাধারণ দর্শকদের প্রবেশ নিষেধ। মুহ্যমান হওয়া গেলো না।

মুরেরা টোলিডো এসেছিলেন অষ্টম শতাব্দীতে, এসে টোলিডোর পীঠগৌরব কমাননি, বরং বাড়িয়েই ছিলেন। শাস্ত্র আর সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষণ ছাড়াও তাঁরা নির্ভেজাল ধর্মনিরপেক্ষতা দেখান -- যুগপৎ খ্রিস্টান এবং ইহুদি -- বলে প্রচলিত। আজও টোলিডোর ইহুদিসংখ্যা নজরে পড়ার মতো। টোলিডোর রাস্তাঘাটে মুরদের পছন্দসই গলিঘুঁজিই বেশী, স্থাপত্যে পাথরের থেকে ইটের ব্যবহার অধিকতর প্রচলিত এবং মুরদের শিল্পকলার ঐতিহ্য বিশেষ প্রকট। আমাদের বাংলা ঐতিহাসিক নবেল-নাটকে যে দামাস্কাস তরোয়ালের কথা পড়েছেন, একসময় সেই তরোয়াল তৈরীর ঘাঁটি ছিলো এই টোলিডো । এখনও টোলিডোতে অনেক দোকান আছে যারা ''খাঁটি দামাস্ক'' বলে ছুরিছোরা আদি বিক্রি করে, তবে গুণীজন বলছেন যে বোকা খদ্দেরের গলা কাটা ছাড়া সেগুলোর খাঁটিত্ব একেবারেই নেই, নিশ্চয় মেনল্যাণ্ড চায়নাতে তৈরী এবং অবধারিত ভেজাল। একমাত্র ভরসার কথা হোলো যে মেনল্যাণ্ড চায়নার অবদান অন্যান্য জিনিষে (যথা শিশুদের পেয় দুধ বা সীসেরঙ-লাগানো খেলনা) ভেজাল পেলে প্রাণান্ত হতে পারে কিন্তু তরোয়াল ভেজাল হলেই ভালো, প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা একটু বৃদ্ধি পায়।

টোলিডো গির্জেতে ভর্তি। যদ্দূর জানি, সবই গথিক গির্জে। গথিক গির্জাটা যদি মনে না করতে পারেন তবে ''শেষের কবিতা''য় অরাবীন্দ্রিক কবির হস্তাক্ষর নিয়ে অমিত রায়ের উক্তি মনে করুন: ''বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুরাল্‌জিয়ার ব্যথার মতো-- খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা গথিক গির্জের ছাঁদে;''। আমার কী মনে হয় জানেন? আমার মনে হয় এইসব কোণাকুণি খোঁচাখুঁচি বুরুজের আসল উদ্দেশ্য হোলো ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, নয়তো ভদ্রলোক সাধুসন্তদের নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, পাপীদের ভার মোটামুটি শয়তানের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। অন্য কিছু গূঢ়তর উদ্দেশ্যও থাকতে পারে, তবে তা কেউ কি আর স্বীকার করবে! একটু খেয়াল করলে দেখবেন, কালক্রমে পাপের বোঝা যতো ভারী হযেছে, গির্জার বুরুজ সব আরো চোখা হয়েছে, এদিকে গির্জের সাইজ আবার প্রতি বর্গমাইল পিছু পাপীর ঘনত্বের ওপর নির্ভরশীল। ভ্যাটিকান বা সেণ্ট পল্‌স্‌ মনে আনুন। টোলিডোতেও তার ব্যত্যয় দেখা যাবে না। এই দেখুন কাশীর কাণা গলির সায়েবী সংস্করণের ফাঁকে গথিক গির্জার চূড়ো। খোঁচটা দেখলেন! আংটির মতো তিনটে ঘাট কেন আছে তা আপনাদের মতো বুদ্ধিমান লোকেদের নিশ্চয বুঝিয়ে দিতে হবে না। [চিত্র ১৫] যাই হোক, কুণ্ডু স্পেশ্যাল নিতান্ত বাণিজ্যিক কারণেই তাঁদের ভ্রম্যতালিকায় এমন জায়গা রাখেন যা তাঁদের বেশীর ভাগ খদ্দেরদের আকর্ষণ করবে, এবং সে কারণেই গির্জা পরিভ্রমণ এসব ট্যুরে এক মুখ্য আকর্ষণ। আমরা যারা পাতি হিন্দু তাদের এতে বড়ো অসুবিধে। তীর্থস্থানে গিয়ে আমরা মেছো বাজারের দৃশ্যে অভ্যস্ত। পাণ্ডাদের হাঁকডাক, থেকে থেকে ''বাবা তারকনাথের. . . '' ইত্যাদি নাড়ীছাড়ানো হুঙ্কার, জলে-দুধে-ফুলে-পাতায় চটকানো হাড়ভাঙানো পেছল মাটি, এসব সামলে ভীড়ের গুঁতোয় ট্যাঁক সামলাতে সামলাতে গাঁদাফুলের স্তূপের নীচে চাপাপড়া মাতৃমূর্তি দর্শন না করলে আমরা তৃপ্তি পাই না। সেখানে এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গির্জে, তা এতোই নিস্তব্ধ যে ফিস্‌ফিস করে কথা বললেও মনে হয় কামান দাগছে, মিট্‌মিট করে মোম বাতি জ্বলছে, মেমসায়েবরা কট্‌মট করে তাকাচ্ছে -- এসব আমরা ঠিক কব্জা করে উঠতে পারিনা। তা ছাড়ান পাবার উপায় তো আর নেই -- গাইড দিদিমণি ঝুঁটি ধরে ঘোরাবে, এই খানে বড়ো সায়েবের কবর, এই তার পাশে মেজ বৌ, এইখানে সন্ত সেবাস্তিয়ানকে কপিকলে ঝোলানো হয়েছিলো, ইত্যাদি, ইত্যাদি -- গিলতেও কষ্ট হয় আবার সায়েবদের বিরক্তিভাজন হবার ভয়ে পারি না ওগ্‌রাতে।

তা যে যাই বলুক, প্রবীণেরা বলেন যে মাদ্রিদ থেকে আর কোথাও যদি না যাও তাহলে অন্তত একবার টোলিডোটা ঘুরে যেও। এতো আঠা নিয়ে কেন বলেন, সেটা একটু রহস্যাবৃত হয়ে রইলো আমার কাছে। যা দেখে আমার রোমহর্ষ হোলো তা প্রবীণদের কাছে নস্যি । দেখা যাক খুঁচিয়ে।

পনেরোশো সাতাত্তরে ইটালী থেকে পালিয়ে এসে টোলিডোতে আস্তানা গাড়লেন এক গ্রীক চিত্রকর, তাঁর নাম ডোমেনিকোস থেটোকোপুলস। আজ সে নাম সবাই ভুলে গেছে, মনে রেখেছে আদরের নাম ''এল্ গ্রেকো'', অর্থাৎ ''গ্রীক''। এল্ গ্রেকো ইটালীতে টিশিয়ানের কাছে ছবি আঁকার কারুকলা শেখেন কিন্তু যৌবনের হঠকারিতায় তখনকার ইটালীয় হিরো মাইকেলেঞ্জেলোকে হতশ্রদ্ধা করার কারণে এই প্রস্থান। খ্যাতির তুঙ্গে অধিষ্ঠিত স্পেনে তখন চিত্রকলার খুব রম্‌রমা, রাজা চতুর্থ ফিলিপ শিল্পকলার, বিশেষত চিত্রকলার ভারী সমজদার না হলেও সমর্থক আর স্পেনের বিত্তশালী গির্জা আর তার অধ্যক্ষরাও ধর্মীয় পট দিয়ে গির্জের বাহার বাড়াতে খরচের কার্পণ্য করেন না। তারপর আমৃত্যু প্রায় চল্লিশ বছর এল্ গ্রেকো অসংখ্য ছবি আঁকলেন, বেশীর ভাগই ধর্মীয়, বা না হলেও আধ্যাত্মিকতাস্পৃষ্ট এবং তার বেশীর ভাগই ছড়িয়ে রইলো এই টোলিডোর গির্জেগুলোতে। পবিত্র টোলিডোতে এল্ গ্রেকো যতো সময় কাটাতে আরম্ভ করলেন ততোই ধুনোর ধোঁয়ার মতো এই পবিত্রতা তাঁকে আচ্ছন্ন করতে আরম্ভ করলো আর তা মূর্ত হোলো তাঁর অসাধারণ চিত্রকলার প্রকাশে। মানুষের দেহ তাঁর কাছে আস্তে আস্তে ''আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো'' প্রদীপের রূপ নিতে আরম্ভ করলো -- দীর্ঘ, ঋজু, ঊর্ধ্বমুখী, তপোক্লিষ্ট, এক অপার্থিব আলোকে উদ্ভাসিত। কুশলী তুলির যাদুতে একই ছবিতে একসঙ্গে দেখালেন মাটির পৃথিবী আর জ্যোতির্ময় স্বর্গধাম । এল্ গ্রেকোর আগেও অনেকে ধর্মীয় ছবি এঁকেছেন (সেকালের চিত্রকলার মোটামুটি রেওয়াজই ছিলো তাই) পরেও আঁকলেন, কিন্তু এল্ গ্রেকোর ধারা আর মুন্সীয়ানা আর কেউ ঠিক এমন করে ধরতে পারলেন বলে মনে হয় না। আমরা যে গির্জেতে গিয়েছিলাম, চার্চ অফ সান্টো টোমে, সেখানে এল্ গ্রেকোর অনেক ছবি ছিলো, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী নজরকাড়া যেটি, সেটির নাম ''কাউণ্ট ওর গাজের সমাধি'', The Burial of Count Orgaz, [চিত্র ১৩] এল্ গ্রেকোর সবচেয়ে নামকরা দুটি ছবির একটি। । বিশাল ছবি, পনেরো ফুট বাই এগারো ফুট, খেলিয়ে কাছা দেবার পরও হাত দশেক বাড়তি থাকে। তার সামনে দাঁড়িয়ে একটু গা ছম্‌ছম করতে লাগলো। না স্যার আমি বজরঙবলীর দেশের লোক, ''ভূত আমার পুত, শাঁকচুন্নি আমার ঝি'', কিন্তু ছবিটা এল্ গ্রেকোর মনন আর কথনে রোমাঞ্চকরভাবে বাঙ্ময়। পরে জ্যাঠতুতো দাদাকে গল্পচ্ছলে ব্যাপারটা বললাম, তিনিও এল্ গ্রেকো দেখেছেন, বললেন হ্যাঁ ভালো বটে তবে সবই ঝুলকালো। তাতো বটেই, তমসা না থাকলে ''তমসো মা জ্যোতির্গময়'' হবে কী করে!

সান্টো টোমেতে এল্ গ্রেকোর আঁকা আরো কিছু ছবি আছে, আছে অন্য শিল্পীদের কাজ -- যথা মুরিল্লো। সেগুলো দেখে তৃপ্তি হোলো। কাছেই অন্য আরেকটা গির্জা, সান্টো ডোমিঙ্গো, সেখানে এল্ গ্রেকোর আরো কিছু ছবি আছে (স্পেনে এসে এখানেই এল্ গ্রেকো প্রথম বড়ো ছবি আঁকার কাজ পান এবং এখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়, অবশ্যই মৃত্যুর পরে)। সে সব দেখা হোলো না, দেখা হোলো না এল্ গ্রেকো মিউজিয়াম। পরে মাদ্রিদ ফিরে প্রাডো মিউজিয়ামে আরো কিছু এল্ গ্রেকো দেখলাম। কিন্তু যেটা না দেখার দুঃখ রইলো তা হোলো এল্ গ্রেকোর খ্যাতনামা দ্বিতীয় ছবিটি, নাম ''টোলেডোর দৃশ্য'', View of Toledo। গাইড পিলর সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করলাম সেই ছবিটি কোথায়। পিলর মুখঝাম্‌টা দিয়ে বলে, আহা ন্যাকামি কোরোনা আর, আমাদের ছেলেমানুষ পেয়ে ঠকিয়ে ঐ ছবিটি কিনে নিয়ে নিউ ইয়র্কে মেট্রোপোলিটান মিউজিয়ামে রেখেছো তো, সেখানে দেখলেই পারো। তাই তো, আমার বোকার মরণ। তারপরে নিউ ইয়র্কে খবর করে দেখি সে ছবি স্পেনেই বেড়াতে গেছে, প্রাডোতে আসবে একমাস পরে। একটা প্রতিলিপি এখানে তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। [চিত্র ১২]াল্‌কাজার দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে ট্যাগাস নদী, তার ওপরের সেতু। আরো কিছু দেখা যাচ্ছে, তবে তা আপনাকে খুঁজে নিতে হবে। আগে ক্যামেরায় দেখা টোলেডো দিয়েছি, সেটার সঙ্গে শিল্পীর চোখে দেখা ছবিটি মিলিয়ে দেখে নেবেন, ঝুলকালিটালি তুচ্ছ করে। তারপর মানুষকে তাড়িয়ে যন্ত্রসভ্যতা যে শিগ্‌গিরি সবকিছু আত্মসাৎ করবে না (রবীন্দ্রনাথ এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন শুনেছি) সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে দুয়েক গেলাস শেরী খেয়ে নিতে

পারেন। ও, শেরী সেবনে যে আপনার কোনো অজুহাত লাগে না সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তাহলেও।

**

মাদ্রিদের প্রাডো মিউজিয়াম, Museo del Prado প্রায় দুশো বছরের পুরনো, পৃথিবীখ্যাত একটি চিত্রশালা। যখন চিত্রশালাটি প্রথম খোলা হয় রাজা সপ্তম ফার্ডিনাণ্ডের আমলে, তখন এটি শুরু করা হয় রাজা এবং তাঁর পূর্বসুরীদের ছবির সংগ্রহের ওপর ভিত্তি করে। উদ্দেশ্য বাকী ইউরোপকে দেখানো যে স্পেনেও ভালো ছবিটবি আঁকা হয়। বেশ কয়েকপুরুষ ধরে স্পেনের রাজপরিবার শিল্প আর চিত্রকলার উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কাজেই তাঁদের সংগ্রহও এমন কিছু হেলাফেলার নয়। তারপর অবশ্য নতুন চিত্রশালা কালকেতুর মতো বাড়তে থাকে, বিশেষত নানান্ গির্জার থেকে ছবি আত্মসাৎ করে -- একদিক থেকে ভালো যে দেখার আনন্দ সীমিত সংখ্যক ধর্মান্ধদের মধ্যে বদ্ধ না থেকে বিশ্বজগতে ছড়িয়ে পড়লো। যদিও প্রাডো তারপর স্পেনের বাইরে থেকে অনেক ছবি জোগাড় করেছে (ফ্লেমিশ, ইটালিয়ান আর ফরাসী বেশী; ডাচ, জার্মান আর ব্রিটিশ চিত্রকলা কম), কিন্তু প্রাডোর মুখ্য আকর্ষণ হোলো স্পেনের কালজয়ী শিল্পীদের ছবির বাহার (এবং স্পেনের রাজাদের পছন্দ-অপছন্দের ইতিহাস)। প্রাডোর সংগ্রহ যে প্রথাগত কেবল ঐতিহাসিক সঙ্কলন তা নয়।

একটা নামী আর বড়ো মিউজিয়ামে যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি অনেক খ্যাতনামা শিল্পীদের ছবি দেখা গেলো -- টিশিয়ান, টাইপোলো, রাফায়েল আবার এদিকে রেম্‌ব্রাণ্ড, রুবেন্স, ভ্যান ডাইক। এল্ গ্রেকো আর মুরিল্লো তো আছেনই। কিন্তু সবচয়ে বেশী করে আছেন যাঁরা তাঁরা হলেন পুরনো স্পেনের দুই দুরন্ধর -- দিয়েগো ভেলাজকুয়েজ আর ফ্রান্সিস্‌কো গোইয়া। স্পেনের ইতিহাসের উত্থানপতনের এক স্মরণীয় দোলাচলের কালে ভেলাজকুয়েজ তুলি হাতে নিয়েছিলেন। স্পেন তখন ইউরোপের বলিষ্ঠতম শক্তি, কিন্তু যুদ্ধে, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ আর গোলযোগে, বাণিজ্যের ক্ষতিতে সেই যশ, সেই ক্ষমতা আস্তে আস্তে ক্ষয় পাচ্ছে। ষোলো বছরের কিশোর চতুর্থ ফিলিপ রাজা হয়েছেন, ফিলিপ বুদ্ধিমান, যদিও রাজকার্যে মন নেই বিশেষ, তবে শিল্প আর সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। ভেলাজকুয়েজ রাজার নেকনজরে পড়েছিলেন, তার ফলে অমাত্যবর্গেরও, কাজেই ছবি আঁকার বরাত পেতে তাঁর অসুবিধা হয়নি, একসময় রাজার পছন্দমতো ছবি আঁকতে সুবিধে হবে বলে রাজপ্রাসাদে থাকতেন। বলা বাহুল্য যে ভেলাজকুয়েজের বহু ছবিই প্রাডোতে আছে, তার মধ্যে যেটিকে সমঝদারেরা সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন সেটির নাম হোলো Las Meninas, Maids of Honor, এইখানে গিয়ে (http://www.artchive.com/archive/p/picasso/meninas.jpg) স্মৃতিটা একটু ঝালিয়ে নিতে পারেন। দশ ফুট বাই নফুটের বিশাল ক্যানভাস, স্বমহিমায় একটা পুরো দেওয়াল জুড়ে শোভা পাচ্ছে, ইচ্ছে করলে এক ঘণ্টার কাছাকাছি কাটিয়ে দিতে পারেন ছবিটির সামনে। প্রসঙ্গত, পরে পাবলো পিকাসো এর অনুকরণে আরেকটি ছবি এঁকেছিলেন, সেটা আর দেখার সুযোগ হয়নি, তবে তার একটা লিঙ্ক হোলো এইখানে (http://www.artchive.com/artchive/p/picasso/meninas.jpg) ।

ভেলাজকুয়েজের প্রায় দেড়শো বছর পরে ফ্রান্সিস্‌কো গোইয়ার জন্ম, চিত্রকলার ইতিহাসে আরেক যুগান্তরের ইঙ্গিত নিয়ে। ভেলাজকুয়েজের মতো গোইয়াও রাজপ্রসাদধন্য ছিলেন, স্পেনের প্রথম রাজচিত্রকরের পদ অধিকার করেছিলেন। অসংখ্য ছবি এঁকেছেন, রাজা, রাজপরিবার আর অমাত্যদের ছবি, নৈসর্গিক, স্থিরচিত্র, ধর্মীয় -- কী না নেই। এল্ গ্রেকো স্থিতু হয়েছিলেন স্পেনের তৎকালীন আধ্যাত্মিক পরিবেশের ওপরে, ভেলাজকুয়েজ এঁকেছেন গৌরবময় স্পেনের খ্যাতি, যশ আর ঐশ্বর্যের মধ্যগগনের ছবি, তাতে কিন্তু গোধূলির ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে, আর গোইয়া চিত্রায়িত করেছেন সন্ধ্যা থেকে ঘোর তমসার দৃশ্য। গোইয়া দীর্ঘজীবী ছিলেন, বিরাশি বছর বয়সে মারা যান এবং যাবার আগের দিন পর্যন্ত ছবি এঁকে যান, কিন্তু তাঁর জীবন খুব সুখের হয়নি, যদিও যশ আর খ্যাতির অভাব তাঁর ছিলোনা। প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভে এক দুরারোগ্য অসুখে গোইয়া তাঁর শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং তারপর মানসিক বিকারেরও উপসর্গ দেখা যায়। শেষের বয়সে যুদ্ধের

বীভৎসতা, ডাকিনীতন্ত্র ইত্যাদি নানান ভয়াবহ বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছিলেন, তার অনেকগুলোই প্রাডোতে যত্ন করে রাখা আছে।

আমাদের বরাত খুব ভালো, আমরা যখন প্রাডোয় গেলাম তখন এক বিশেষ ঘটনার দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাডোতে গোইয়ার এক বিশেষ প্রদর্শনী চলছে, ''যুদ্ধের কালে গোইয়া'', Goya in Times of War, সেখানে শুধু প্রাডোর সংগ্রহই নয়, সারা বিশ্ব থেকে গোইয়ার ছবি সংগ্রহ করে প্রায় দুশোটি ছবির এক বিশাল উপচার উপস্থিত করা হয়েছে। সেই প্রদর্শনীর কথা বিশদ করে লেখার মতো বিদ্যে বা বুদ্ধি আমার নেই তবে একটি ছবির মুখোমুখি দাঁড়ানোর কথা আমার বাকী জীবন মনে থাকবে। সেই ছবিটি হোলো ''তেসরা মে ১৮০৮'', The Third of May, 1808, [চিত্র ১৭] প্রায় নফুট বাই বারো ফুটের এক আশ্চর্য শিল্পকীর্তি। এই ছবি এবং এর যমজ ভাই, ''দোসরা মে, ১৮০৮'', The Second of May, 1808, এদের মধ্যে স্পেনের ইতিহাস খানিকটা ধরা আছে, এবং যে ঐতিহাসিক ঘটনার কথা এরা বলছে দুহাজার আট সালে তারই দ্বিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান।

উনিশ শতাব্দীর প্রথম দশকের গোড়ার দিকে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান, তাঁর ভাই জোসেফ বোনাপার্ট, স্পেনের অপদার্থ রাজা চতুর্থ চার্লস্, রাজপুত্র সপ্তম ফার্ডিনাণ্ড, রাজমন্ত্রী গোডয় -- এদের সবাইকে নিয়ে ইতিহাস এক বীভৎস চক্রান্তের জাল বুনেছিলো। অনেকদিন ধোঁয়াবার পর শেষে দোসরা মে অগ্ন্যুদ্গারণ শুরু হয় যখন স্পেনের নাগরিকরা মাদ্রিদে ফরাসী সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাতে ফরাসী সৈন্যসহ প্রভূত প্রাণক্ষয় হয়। তেসরা মে সকালে ফরাসী সেনারা শাস্তি হিসেবে দোষী-নির্দোষী নির্বিচারে মাদ্রিদের সাধারণ মানুষদের হত্যা করে। এ ছবি সেই হত্যাকাণ্ডের ছবি, পণ্ডিতেরা বলেন আধুনিক চিত্রকলার প্রথম ও বিশেষ উজ্জ্বল উদাহরণ। গোইয়া ছবিদুটি এঁকেছিলেন প্রায় ছবছর পরে, আসলে এই বিদ্রোহ আর তৎপ্রসূত হত্যাকাণ্ডের তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন কিনা তাও জানা যায় না। বস্তুত বিদ্রোহের পর শান্তি ফিরে এলে গোইয়া রাজন্যবর্গের বিরাগভাজন হয়েছিলেন এবং রাজরোষ এড়াবার জন্য তিনি স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে এই ছবিদুটি আঁকার অনুমতি ভিক্ষা করেন এবং পান। ছবির বাঁদিকে মৃত, মৃত্যুমুখী আর মৃত্যুভীতদের ভীড়, ডাইনে বন্দুকধারী, নামহীন, পরিচয়হীন, পুঞ্জীভূত করাল মৃত্যু। ছবির মধ্যে দুহাত ছড়িয়ে যে মানুষটি, সে কি অবধারিত মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে, নাকি তার ঘৃণাভরা চোখে মৃত্যুকে অবজ্ঞা, কিংবা অবিচারের বিপক্ষে সত্যের শেষ প্রতিরোধ -- সে কী বলতে চায়? ছবির বন্দুকে অবশ্য গুলি ছোটেনা, এই মানুষটির চাহনি কিন্তু অনেকটা সময় আমার চিন্তা এবং পরে আমার স্বপ্নকেও আচ্ছন্ন করে রাখে। কালজয়ী শিল্পকলা। প্রসঙ্গত,এই ছবির অনুকরণে পিকাসো একটি ছবি এঁকেছিলেন, গুগল করে দেখতে পারেন, তবে সেটি কিন্তু আমাদের আমেরিকানদের অগ্নিমান্দ্য ঘটাতে পারে।

বৌদি মাথার দিব্যি দিয়েছিলেন যাতে আপনাকে বেশী তত্ত্বকথা না শোনাই, তাতে নাকি আপনার রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। তাহলে এই কথাটা ভেবে দেখবেন। আবহমান কাল ধরে আমরা, রিরংসু পাপী পুরুষেরা সুন্দরী মহিলা দেখলেই মনে মনে যে পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে থাকি, গোইয়া তাকে মূর্ত করেছেন দুটি নামকরা ছবিতে -- সুন্দরী, সবস্ত্রা ও বিবস্ত্রা, Maja Clothed এবং The Naked Maja। গোডয় সায়েব রাজার প্রধান মন্ত্রী, তাঁর ফরমাসে ছবিদুটি আঁকা। বসনাবৃতা ঝুলতেন বিবসনার সামনে, মন্ত্রীর পেয়ারের লোকেরা দর্শন পেতেন কপিকল ঘুরিয়ে। মনে রাখবেন সেকালে এসব ইণ্টারনেট-ফেট ছিলো না, প্লেবয় বা পেণ্টহাউসও অনেক পরের কথা। সায়েবরা পড়তেন টম জোন্স্, আমরা পড়তাম গীতগোবিন্দ। নতুন রাজা ফার্ডিনাণ্ডের এসব মস্করা আবার ভালো লাগেনি, তিনি গোইয়ার পেছনে পুনরুজ্জীবিত ইন্কুইজিশন লেলিয়ে দিয়েছিলেন। লেখাটি যদি সেই ভয়াবহ এক্স-রেটিং পেয়ে যায়, সেই আশঙ্কায় ছবিগুলি দেখালাম না, তবে যদি যান প্রাডোয় তাহলে ছবিদুটো দেখে নেবেন। তার আগে বৌদিকে নাকে পাউডার লাগাতে পাঠাতে ভুলবেন না যেন!

প্রাডোপ্রাঙ্গণের থেকে গোটা দুয়েক ছবি দিলাম প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে। [চিত্র ১৪ ও ১৬]

**

অনেকক্ষণ চুপচাপ যে, কী ঘটলো আবার ? আপনার তো আবার ঘোর সন্দেহবাতিক, তাই ভয় হয় কে আবার কী চুকলি খেয়ে দিলো। নিশ্চয় ভাবছেন যে এল্ গ্রেকো, গোইয়া, ভেলাজক্যুয়েজ, এসব বড়ো বড়ো নাম হেঁকে ছোকরা পিকাসো, দালি, মিরো -- এসব নামের ব্যাপারে সাড়াটি দেয়না কেন? এঁরা আবার আধুনিক চিত্রকলার দিক্‌পাল, সাপ না ব্যাঙ কী যে আঁকেন তা অর্ধেক সময় নিজেরাই বোঝেন না, আর কালকের ছোকরা পোনু এসে তা আমাদের বোঝাবে, তবেই হয়েছে -- এ যেন তাঁতির ফারসী পড়া! ধরেছেন ঠিকই, তবে এই নিশ্চুপতার জন্য আমাকে খুব একটা কসরৎ করতে হয়নি। স্থানাভাবের কারণে উনিশশো বিরানব্বইতেই মাদ্রিদ সরকার এইসব প্রাতঃস্মরণীয়দের আরেক যাদুঘরে চালান করেছিলেন -- Centro de Arte Reina Sofia। জীবনের আরো অনেক রহস্যের মতো সেটা আমার জানা ছিলোনা, যখন জানলাম তখন কুণ্ডু স্পেশ্যালের ঘণ্টা পড়ে গেছে। ফলং এ যাত্রায় আমি, আপনারা এবং তাঁরা ছবিওলারা-- সবাই বেঁচে গেলাম ও গেলেন।

রাজশেখর বসুর 'উলট পুরাণ' গল্পে ভারতীয়রা ইউরোপে অধিকার বিস্তার করেছিলো। তারপর বিজয়ীদের অধিকার প্রয়োগ করে চেনা জায়গার নতুন নামকরণ করে, যেমন মেডিটেরেনিয়ান সি = মেতিপুকুর, সুইৎজারল্যাণ্ড = ছছুরাবাদ ইত্যাদি। রাজশেখরবাবু আর একটু এগোলে পর্তুগালের নাম নিশ্চয়ই দিতেন বরিশাল। আইবেরিয়ান উপদ্বীপে পর্তুগিজরা বাঙালের সামিল।

পর্তুগাল আইবেরীয় উপদ্বীপের অংশ, তাই স্পেনের সঙ্গে বেশ খানিকটা ইতিহাস ভাগাভাগি করে নিয়েছে। আশ্চর্যের কথা এই যে স্পেন আর পর্তুগালের মধ্যে কোনো সরাসরি ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারিত নেই, যা আছে তা সম্পূর্ণ ইতিহাস নির্দেশিত। স্পেনের মতো সেই ফিনিসীয়, গ্রীক, কার্থেজীয় এবং অবশ্যই রোমের আধিপত্য, খৃস্টধর্মের প্রসার এবং উত্তর আফ্রিকার মুরদের আগমন ও রাজত্ব স্থাপন দিয়ে গল্প শুরু। এরমধ্যে যথারীতি হানাহানি, রক্তক্ষয় মাৎস্যন্যায় ইত্যাদি পুরোদমে চলেছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে পর্তুগালের নিজস্ব রাজা এলেন। তারপর আবার ভ্রাতৃবিরোধ, খেয়োখেয়ি, ষড়যন্ত্র, রক্তক্ষয় -- আরবরা এলো, স্পেন কিছুদিনের জন্য রাজত্ব করে গেলো, নেপোলিয়নের জোরে ফরাসীরা একবার ঘুরে গেলো। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে পর্তুগিজ আর বৃটিশদের মধ্যে বেশ ভাব, নানান চুক্তি এখনো অবধি বলবৎ আছে। শেষে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পর্তুগালের মানুষেরা রাজা-রাজড়াদের নিয়ে তিতিবিরক্ত হয়ে বিদ্রোহ করলো, যথারীতি দলীয় সঙ্ঘাত আর অপূরিত প্রত্যাশার হাত ধরে গণতন্ত্র এলো,-- রাজবেশে নয়, একনায়কত্বের ছত্রছায়ায়, নিন্দুকে বলে ফ্যাসিস্ট সরকার। পর্তুগালের সেই তিনি হলেন সালাজার,দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করে গেলেন প্রায় চল্লিশ বছর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পর্তুগাল কোনো দলেই যোগ দেয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সালাজার কর্তা, অতি চালু লোক, তিনি এবারও গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করলেন। হিটলার অতো সহজে ছাড়বার পাত্র নয়, শেষপর্যন্ত সালাজার জার্মানদের কিছু খনিজ দিতে বাধ্য হন। তবে পলাতক ইহুদীদের সালাজার আশ্রয় দিয়েছিলেন আর মুক্তহস্তে সাহায্যও করেছিলেন। অনেক ইহুদীর প্রাণ রক্ষা পায় তাতে। সালাজার মারা যাবার পর সংবিধান আবার জীবন পেলো। এখনকার সরকার মোটামুটি ভালোই কাজ চালাচ্ছেন বলে শুনি।

স্পেন থেকে পর্তুগালে ঢুকে প্রথম যা দেখলাম সে হোলো কর্কগাছের বন। আসলে বন নয় বাগান, বেশ তরিবৎ করে সোজা সোজা লাইন করে লাগানো বাগান। কর্ক চেনেন তো, আরে ছিপি রে মশায় ছিপি। না চেনেন না, ধান্যেশ্বরীর ছিপি খুলে খুলে হাতে কড়া পড়ে গেলো, ইদিকে ছিপি খুলে গোটাদুয়েক সিন্ধবাদের জিন ছেড়ে এসেছেন ভদ্রসমাজে, আর আপনি কর্ক চিনতে পারছেন না, আর হাসাবেন না মশায়। প্লাস্টিকের যুগ শুরু হবার আগে এই সব ছিপির মশলা ছিলো কর্ক। আসলে কর্ক ওক বলে একরকম মাঝারি সাইজের চিরহরিৎ গাছ হয়, কর্ক হোলো সেই গাছের বল্কল। না অতো দাঁত খিঁচোবার কিছু নেই, ছাল ছাড়িয়ে নিলে গাছ কিছু মরে যায়না, আবার নতুন উদ্যমে ছাল তৈরী করে। পরশুরামের প্রেমচক্র যদি পড়ে থাকতেন তাহলে দেখতেন যে সেকালে ঋষিরা, অন্তত ঋষিপুত্ররা বেলকাঠের ল্যাঙট পরতেন আর বল্কল রাখা থাকতো উদ্ভিন্নযৌবনা ঋষিকন্যাদের

জন্য। অতএব মানবসমাজকে বিনা আপত্তিতে বল্কল জোগান দেবার ব্যাপারে কর্ক ওক গাছের যে আবহমান কাল থেকে বিশেষ আগ্রহ থাকবে, তার মধ্যে আশ্চর্য হবার কী আছে? কর্ক গাছের বিফোর আর আফটার ছবি একসঙ্গে এইখানে দেখুন। [চিত্র ১৮] কর্ক দিয়ে নানান সৌখীন জিনিসপত্র, এমন কী মেঝে অবধি তৈরী হয়, তাতে আমাদের, অন্তত আমার কিছু এসে যায়না। কর্কের কথা লিখলাম এই কারণে যে পৃথিবীতে যতো কর্ক লাগে তার অর্ধেকের বেশী আসে পর্তুগাল থেকে, আর সেখানে কর্ক গাছ কাটা বেআইনি এই কথাটা জানাবার জন্য। স্পেনের গেঁয়ো বাঙাল তুতো ভাই বলে পর্তুগাল কোথাও কলকে পায়না, তাই একটু স্নেহ দেখালাম আর কী। কুণ্ডু স্পেশ্যাল অবশ্য জলযোগ–বিয়োগের জন্য থামলো যেখানে সেখানে এক প্রমাণ সাইজের দোকান, তারা শুধুই কর্কের জিনিষ বিক্রি করে। আমি আবার এসব জায়গায় গিয়ে শিবনেত্র হয়ে থাকি, যাতে গিন্নি কী চোট দিচ্ছেন তা দেখতে না হয়। তবে কর্কের এতো বাহার দেখলাম দাদারও অভিজ্ঞতার বাইরে, কর্কের টুপির দাম নিয়ে কিছু তকরার করতে এলেন না। কর্কের মিনিস্কার্ট পরা শকুন্তলাকে কেমন দেখছিলো তা পুরোপুরি উপলব্ধি করার আগেই আরো নজরকাড়া জায়গায় পৌঁছে গেলাম। তার নাম ফতিমা।

ফতিমা–র (পর্তুগাল গ্রামের নাম, হজরত মুহম্মদের মেয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই; এই ভ্রান্তিনিরসনকে ইস্কুলে 'দেশভ্রমণের উপকারিতা' রচনায় চালাতে পারেন)মেরী মাতা একেবারে আমাদের স্বপ্নাদ্য ব্যাপার। ১৯১৭ সালে ফতিমা গ্রামের তিনটি চাষার ছেলেমেয়েকে ঠাকরুণ বেশ কয়েকবার দেখা দেন, নানান্ উপদেশ দেন এবং তিনটি প্রাণঘাতী গুহ্য কথা বলে যান –– তৃতীয়টি নিয়ে আবার রীতিমত রোমাঞ্চকর রহস্যকাহিনীও আছে। এসব ক্ষেত্রে যেমনটি হওয়া উচিত, এই তিনজন ছাড়া আর কেউ জননীকে দেখতেও পেতো না, কথা শুনতেও পারতো না। তাই অন্য সব পাপীদের বিশ্বাস জন্মাবার জন্য জননী আবার অক্টোবর মাসে এসে সত্তরহাজার মানুষের সামনে সূর্যের অগ্নিগোলক নিয়ে লাট্টু খেলে তাক লাগিয়ে যান। এসব সাহেব–মেমদের ব্যাপার স্যার, এখানে শুধু ছোলায় দুধ ঢেলে শিবলঙ্গ প্রকট করলেই চলবে না, ওজনে বেশ ভারী কিছু দিতে হবে। তারপরে অবশ্য যা হবার তাই হয়েছে, এদেশেও বা ওদেশেও, সব সমান ব্যাপার। ফতিমায় মন্দির, থুড়ি গির্জা তৈরী হয়েছে, মাদুলি, জলপড়ার সাহেবি সংস্করণ সব পাওয়া যায়, আমরা দণ্ডী খাটি, ওঁরা হাঁটু ভর করে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আসেন। চাঁদা ওঠে, তার সদ্ব্যয়ও নিশ্চয় হয়, তিন তিনটি পোপ ফতিমায় গিয়ে ক্যাথলিক ধর্মের উৎকর্ষ নিয়ে বাণী দিয়েছেন। সায়েব বলে এঁরা প্রযুক্তিতে একটু বেশী অগ্রসর, তাঁরা ইন্টারনেট মারফৎ চুটিয়ে বাণী ও পুণ্য বিতরণের ব্যবসা করেন, বিশ্বাস না হয় www.fatima.org–এ গিয়ে দেখুন, সেখানে fatima shoppe – ও আছে। এ পথে আমরাও যাত্রা শুরু করেছি, তবে খুবই সদ্য বোধহয়, কেননা গুগলে কালীঘাট বা তিরুপতির দর্শন পাওয়া গেলেও বাণিজ্যের ব্যাপারটা ব্যাপারটা এখনো খুব ভালো দানা বেঁধে উঠতে পারেনি বলে বোঝা যায়। [চিত্র ১৯ ০ ২০]

ভ্রমণের বইতে লিসবনের নাম শোনা যায বেশ, কিন্তু কেন তা উদ্ধার করার অবকাশ হোলো না আমাদের। [চিত্র ২১] স্লো গ্লোবের চূড়ান্ত, গাড়ীর খাঁচা থেকে পারতপক্ষে বেরোনো গেলো না, বেরোলেও সেই গির্জে দেখার জন্য। অথচ লিসবনের ভৌগোলিক অবস্থান খুব ভালো, ট্যাগাস নদী যেখানে অতলান্তিকে মিশছে সেখানে সাতটি পাহাড়ের কোলে (অনেকটা রোমের মতো) লিসবন শহর। পর্তুগালের রাজধানী, সেই রোমানদের কাল থেকে নানা রাজত্বের উত্থানপতনের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। ট্যাগাস নদী পার হবার জন্য দুটো সেতু আছে, পর্তুগিজদের খুব গর্ব তা নিয়ে। একটির নামকরণ হয়েছিলো সালাজারের নামে, তবে তাকে বিদায় করার সঙ্গে সঙ্গে সেতুর নামও বদলানো হয়েছে, এখন বলে পঁচিশে এপ্রিলের সেতু। আরেকটির নাম ভাস্কো ডা গামা সেতু, সেটি দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে। রাস্তাঘাট মাদ্রিদের মতো চকচকে মনে হোলো না, দুপুরের দিকে বেজায় ভীড়ও বটে। পুরনোকালের বাড়ী কিছু চোখে পড়লো, পুরনো মানে সেই পুরাতত্ত্বের ব্যাপার তা নয়। ১৭৫৫ সালে লিসবনে এক বোম্বাই ভূমিকম্প হয়, তাতে পুরনো স্থাপত্যের অনেক কিছুই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ভূমিকম্পের পরে তখনকার মন্ত্রী, নাম মার্কুইস দ্য পোম্বল, তিনি চট্জলদি লিসবন সারাই করেন, পুরনো যা কিছু ভেঙে পড়েছিলো সেসব ঝেঁটিয়ে ফেলে, সব নতুন করে।

বোধহয় সেই জন্যই গথিকের চেয়ে পুরনো কিছু, যথা মূর স্থাপত্য আমার চোখে পড়লো না। আবার এদিকে একেবারে আকাশ ছোঁয়া না হলেও ত্রিশঙ্কুর পায়ে সুড়সুড়ি দেবার মতো বাড়ীও অনেক। কিন্তু সবতাতেই কেমন যেন ছ্যাতলা পড়েছে, অনেকটা বড়োবাজারের দিকের এর ওর ঘাড়ে পড়া লক্ষলক্ষ খড়খড়িঅলা বাড়ীগুলোর মতন। বোধহয় সমুদ্রের অতো কাছে বলে নোনা হাওয়ার ফল হতে পারে, আর এক হতে পারে যে এসব পার্থিব ব্যাপার নিয়ে পর্তুগিজরা বিশেষ মাথা ঘামায় না। অবশ্য বায়বীয় ব্যাপার, যথা সাহিত্য, শিল্প, এসব নিয়েও পর্তুগিজদের খুব একটা মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয়না। সাহিত্যে পর্তুগাল থেকে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এমন দুয়েকজনের নাম বলুন চট্‌পট। পারলেন না তো, লজ্জার কিছু নেই, এক এবং অদ্বিতীয় হোসে সারামাগো, মাত্র ১৯৯৮ সালে নোবেল পেয়েছেন। স্পেনে পাঁচটি। কয়েকজন পর্তুগিজ চিত্রকরের নাম করুন। পেলেন কিছু? স্পেনের কেরদানির কিছু আভাস তো আগের চিঠিটাতেই পেয়েছেন। [চিত্র ২২]

পর্তুগালের বড়ো গর্বের বিষয় হোলো তাদের আবিষ্কারকরা (explorer) এবং তাঁদের কৃপায় পাওয়া উপনিবেশ (colony) ও তৎপ্রসূত 'রাজ' (Raj)। এবং অবশ্যই পোর্ট আর মাদেইরা মদ্য। মদের দোকানের ছড়াছড়ি আর গাইড বইতে দেখছি লিসবনের পথেঘাটে আবিষ্কারকদের প্রস্তরমূর্তিরও ছড়াছড়ি। এদের মধ্যে ভাস্কো ডা গামা আবার পর্তুগিজদের বেশী পছন্দের লোক। আমরা, যারা ভাস্কোর চরণস্পর্শে পূত হয়েছি, আমাদের চিন্তাটা একটু অন্যরকম। ভাস্কো প্রথম ভারতের মাটি ধন্য করলেন ১৪৯৮ সালে কালিকট বন্দরে, পথে কিছু আরব বাণিজ্য জাহাজ যা হাতের কাছে পেলেন তা লুটতরাজ করতে ছাড়লেন না। [চিত্র ১০] বাণিজ্যের বন্দর হিসেবে কালিকটের তখন বেশ নাম, আরব বণিকরা হরদম যাতায়াত করেন। ভাস্কো এসে সেখানকার শাসনকর্তা জামোরিনের সঙ্গে শুরু থেকেই সম্পর্কটা তেতো করে ফেললেন, শেষমেষ জামোরিন মালপত্তর বন্ধক রেখে ভাস্কোকে প্রায় খালিহাতেই বিদেয় করলেন। পথে ঝড়ের কবলে কয়েকটি জাহাজ আর অনেক নাবিক হারিয়ে ভাস্কো দেশে ফিরলেন। দেশের লোকে ভাস্কোকে নিয়ে বেশ ভালোই মাতামাতি করলো বটে কিন্তু শুধু হাতে ফেরার ব্যাপারটা ভাস্কোকে ভুলতে দিলো না। তার উত্তরে ভাস্কো ১৫০২ সালে আবার কালিকট এলেন, এবার গুটি বিশেক রণপোত নিয়ে। এসে দেখেন তাঁর যে সব লোকজন রেখে গিয়েছিলেন তাদের বধ করা হয়েছে, অতএব ভাস্কো কালিকটে কামান দাগলেন, দক্ষিণে কোচিনরাজ্যে গিয়ে দোস্তি করে বাণিজ্যের সনদ নিলেন। কালিকটে ফেরৎ আসার সময় পথে কয়েকটি নিরস্ত্র হজযাত্রী ভরা জাহাজ ডুবিয়ে জামোরিনের গলায় গামছা দিয়ে সনদ নিয়ে ফিরলেন দেশে। এবার মহা উৎসব লেগে গেলো। যাঁরা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর কাহিনী ''রক্তসন্ধ্যা'' পড়েছেন তাঁরা শিহরণের সঙ্গে এই ঘটনা স্মরণ করতে পারেন। আসলে ভাস্কো ছিলেন জবরদস্ত জলদস্যু, তা সেকালে জলে নামলেই সবাই অল্পবিস্তর এসব করে থাকতো। তবে ঐ বললাম, ''রক্তসন্ধ্যা'' পড়ে ভাস্কো সম্বন্ধে আমার খুব একটা উচ্চ ধারণা নেই, জানেনই তো আমি সব ব্যাপারে একটু ন্যালাখ্যাপা, সত্যিমিথ্যের তফাৎ করতে পারিনা। তো এই জলদস্যুকে নিয়ে এতো লাফালাফি, আমার একটু আদিখ্যেতা মনে হোলো, এই মাত্র।

তবে আমরা মা মনসা, ওলাইবিবি -- এঁদের বরপুত্র, আমাদের হেনস্তা করে অতো সহজে পার পাওয়া যায়না। ভাস্কো যখন প্রায় বিশ বছর পরে আবার এলেন আমাদের বাঁদরামি ঠাণ্ডা করতে, তখন আমরা নরকের মশা এনে ভাস্কোকে ম্যালেরিয়া ধরিয়ে দিলাম। সে ব্যাটা ডাকাত মারা গেলো তাতেই, তার আর দেশে ফেরা হোলো না। কোচিনে কবর হয়েছিলো, কিন্তু কয়েকবছর পরে ফেরৎ নিয়ে লিসবনের জেরোনিমো গির্জেতে তাঁকে কায়েম করা হোলো। এখনো সেখানেই, কবরের ছবি হচ্ছে চিত্র নং ২৩।

লিসবনে শুনতে পেলাম পর্তুগালের লোকসঙ্গীত (বইতে দেখছি নাগরিক লোকসঙ্গীত বলছে, urban folk music যদিও তার অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম হোলো না) , নাম ফেডো। শুরুতে বাজার গরম করার জন্য দুচারজন তরুণ-তরুণী এসে ছোটো স্টেজে নাচলেন, কী নাচ বা কী ঘরানা তা জানলাম না। দেখে গাজনের সঙের কথা মনে পড়লো। আমি আবার পরের দিন ফ্ল্যামেঙ্কো দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলাম, আমার খুব চিন্তার উদ্রেক হোলো, এই যদি তার সকাল হয় তাহলে দিনের কী অবস্থা

তাই ভেবে। তারপর যথাক্রমে এক মোটা মধ্যবয়সী, এক কৃশকায় বৃদ্ধ, এক দশাসই মহিলা, আবার বৃদ্ধ ইত্যাদি এসে মঞ্চে হয় অম্লশূলের ব্যথা জানালেন বা মড়াকান্না কাঁদতে লাগলেন, এই হোলো ফেডো। সঙ্গে গীটারও বাজছিলো। ভাষা বুঝি না, তাই সান্ত্বনা দেওয়া গেলো না। কিন্তু পরে বই পড়ে জানলাম ঐ গান মড়াকান্নাই বটে, ওসব দুঃখের গান -- দেশছাড়া ক্রীতদাস, মহাসাগর আবদ্ধ নাবিক, জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া সৈনিক, এই এদের গান আর কী। আমাদের কোলকাতার রিক্সাওয়ালারা যদি কাজরী গায় তাহলে কী তাকে পর্তুগালের ফেডোর সঙ্গে তুলনা করা যাবে? জানিনা, তবে এটা জানলাম ফেডোকে বলা হয় পর্তুগালের প্রাণের ধন, heart of its soul এবং বেজায় জনপ্রিয়, রপ্তানিও বলছে বেশ ভালোই। খাস রামগরুড়ের ছানা সালাজার সাহেবও ফেডো গাইবার অনুমতি দিয়েছিলেন। বিল ক্লিন্টন নাকী ফেডো শুনে এতো অভিভূত যে তিনি জগৎব্যাপী ফেডো প্রচার করবেন বলে সংকল্প নিয়েছিলেন। এ ঘটনা প্রাক্-মণিকা না উত্তর-মণিকা, তা স্মরণে আসছে না, তবে ক্লিন্টন সায়েবের প্রতিশ্রুতি পালন আর হয়ে ওঠেনি, এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। অবশ্য বেল পাকলে কাকের কী? [চিত্র ২৪, ২৫, ২৬]

আমাদের কুণ্ডু স্পেশ্যালের সায়েব পয়সার সাশ্রয় করার জন্য দক্ষিণ স্পেন ভ্রমণে তিনটি দলকে জুড়ে দিলেন, যাতে একটা বড়ো বাস এবং একটি দ্বিভাষী গাইডে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। তিনটি দলের একটি আমরা। মাথায় ঘোমটা-টানা (হিজাব, ঐ হোলো মশাই; বোরখা নয় কিন্তু) একগুচ্ছ তরুণীর দল, তাঁরা আমেরিকায় থাকেন, ভালো ইংরেজী বলেন কিন্তু দেশ ঐ মধ্য প্রাচ্যে -- বোধহয় সিরিয়া হবে -- এবং প্রায়শই তরুণীসুলভ কিচির-মিচির করেন, তাঁরা হলেন দ্বিতীয় দল। একদল স্প্যানিশভাষী আধবুড়োর গুষ্টি হোলো তৃতীয় দল। আমাদের পণ্ডা, থুড়ি পাণ্ডা মহিলা বহুদিন ধরে আমাদের মতো গেঁয়ো ভূতদের কালীঘাট, গড়ের মাঠ, জাদুঘর দেখিয়ে তালিম নিয়েছেন, সাঁইতিরিশটি জংলীকে শাসনে রাখা তাঁর কাছে নস্যি। সকালে সবাই বাসে উঠে বসে আছি, সরস্বতীর দেখা নেই, তার ঈপ্সিতপ্রাপ্তি হয়েছে বোধহয়, আর বুড়োরা সেই সুযোগে চারদিকের সুন্দরীদের দেখছে আর মনে মনে নম্বর দিচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে সরস্বতী দেখি দুটি তরুণীকে তাড়িয়ে নিয়ে আসার ভান করে এসে বাসে উঠে পড়লো, বাস দিলো ছেড়ে। এমন সময় মাইকের খড়্খড়্, বাসের সামনে থেকে কাংস্যকণ্ঠনিনাদে তীব্র ভর্ৎসনা -- এসব কী অসভ্যতা, কেউ কেউ দেরী করছে আর বাকী সবাই হাঁ করে বসে, কী অবিবেচক সব। এর পরে এমনটি হলে বাস আর দাঁড়াবেনা, নিজের পথ নিজে দেখে নিতে হবে। দুতিনদিন রোজই আমরা বকুনি খাই, আজ দেরী হোলো তো কাল কে বেশী লাগেজ নিয়ে এলো ইত্যাদি। তারপর তো 'শিবঠাকুরের আপন দেশে'-র মতো ব্যাপার, আইনকানুনের আর শেষ নেই -- সকালে সাতটা পনেরোতে ব্রেকফাস্ট , দেরী কোরো না, লাইন দিয়ে দাঁড়াও, ঠেলাঠেলি কোরো না, এদিকে যেওনা, সেদিকে তাকিও না, কথা বলছি কানে যাচ্ছে না বুঝি, বোকার মতো প্রশ্ন কোরো না ইত্যাদি, ইত্যাদি। কোনোমতে প্রাণ হাতে করে গিয়ে ঠাকরুণকে বললাম, দেবি, আমরা এই ট্যুরে এসেছি বন্ধু বান্ধব নিয়ে নিছকই মজা মারতে, এতোরকম আইন জারী করলে মজাটা আর কোরবো কখন? হিংস্র হাসি হোলো কিন্তু দয়া হোলো না। শেষে দলের মুকুজ্জে, দজ্জিপাড়ার ছেলে, সেই আমাদের মান রক্ষা কোরলো; বাসের টিকিটে নিজের আর বৌয়ের নাম দিলো মুখোপাধ্যায়। এই নাম দুবার উচচারণ করতে মার্গিতব্যার জিভে সাঙ্ঘাতিক যে গেরো পড়লো তা খুলতে তার দুচারদিন লেগেছে, এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। কে বলে বাঙালী ভীরু।

**

সকালে ব্রেকফাস্টে নেমে দেখি দাদা একাই ডিমভাজা সামনে নিয়ে গ্রেপ জুসের গ্লাসের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছেন যদি ব্রহ্মতেজেই ওটিকে মদিরা করে ফেলা যায় । অতি চারুশীলা বৌদিকে দেখা গেলো না, ওপরে ঘরে তখনো পুজো করছেন । দাদাকে বললাম এবার থেকে একটু কম পাপ করুন, বৌদি বেচারী একা আর কতো প্রাচিত্তির করবেন । ব্রহ্মতেজে আমার রক্ত মদিরা হবার আগে পালিয়ে আসতে পেরেছি । তাতে আবার অনেকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে বলছেন বুঝি?

লিসবন থেকে আবার স্পেনে ফেরৎ (ভাগ্যিস), লক্ষ্য আন্দালুসিয়া অঞ্চলের সেভিল্লা নগরী, Seville, কিন্তু পথে মেরিডা Merida শহরে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, বাস পরিবর্তন (দিদিমণির কথা আগে বলে ফেলেছি) এবং সেই ফাঁকে মেরিডা ভ্রমণ । পরে বুঝলাম ভ্রমণটা নিছকই কুণ্ডু কোম্পানীর ভ্রম্যতালিকা বর্ধন ও তজ্জনিত মুদ্রাপহরণ । কারণ মেরিডাতে গত হাজারদুই বছর ধরে কিছুই হয়নি । তার আগে রোমানরা বেশ থানা গেড়ে বসেছিলো তার বেশ কিছু নমুনা বহাল তবিয়তে বজায় আছে এখনো । আর্চের কৌশলে বাহারী, উঁচু এবং বড়ো সেতু আর জলপ্রণালী, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, এবং পর্যটকপ্রদর্শিকা, গাইডবুকের ভাষায় অবশ্য দ্রষ্টব্য রঙ্গমঞ্চ আর ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ -- থিয়েটার আর অ্যাম্‌ফিথিয়েটার । চরণামৃত কী না অমৃত, খেয়ে দেখি শুধু জল । তাহলেও, পয়সার মাল, ফেলতে কষ্ট হয়, তাই গোটা দুয়েক ছবি দিলাম । [চিত্র ২৭ ০ ২৮] তবে দুয়েকটা তথ্যে মজা পেতে পারেন । প্রেক্ষাগৃহে ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে, ঐ হোলো দর্শকদের বসার জায়গা । সামনের সারিতে, যাকে এখানে বলে অর্কেস্ট্রা, সেখানে অবশ্যই স্থানীয় দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা বসতেন, তারপর সামাজিক পদমর্যাদার বিপরীত হারে অন্যান্যরা টঙের দিকে উঠতেন । সবার ওপরে, যেখানে বাতাস লঘু হয়ে এসেছে, অবশ্যই দরিদ্রনারায়ণদের জায়গা । উপলবিস্তৃত আসন যদি দেখেন তাহলে সর্বহারাদের আনন্দদানে রোমান ঔদার্য বিষয়ে আপনার মনে কঠিন কোনো প্রশ্ন জাগবে না । তাদের ভারসাম্যহীন চলনের কারণ সম্বন্ধে আপনার ভ্রান্তিরও অবসান হতে পারে । অ্যাম্‌ফিথিয়েটার ছিলো যুগপৎ বন্যজন্তু, যথা বাঘ, সিংহ ইত্যাদির সংরক্ষণ আর খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র । তবে রোমসাম্রাজ্যে মেরিডার স্থান ধাপ্‌ধাড়া গোবিন্দপুরের কাছাকাছি বলে আমার বিশ্বাস এবং সে কারণে মথি, পল, লুক আদি প্রথম শ্রেণীর খ্রিশ্চান পাওয়া যেতো না অতএব স্থানীয়দের নিয়ে কাজ চালাতে হোতো । সেক্ষেত্রে দর্শকদের অরুচি এড়াবার জন্য প্রজ্জ্বলিত চিতার দৃশ্য এবং অসিবাহী, gladiator, গোষ্ঠীর তামাসারও ব্যবস্থা ছিলো । ''তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে, উড়ে যায়'' মেরিডার ''পথের ধূলি পরে'' ।

মাদ্রিদ যদি হয় দিল্লী, বার্সিলোনা মুম্বই, তাহলে সেভিল্লাকে কোলকাতার সঙ্গে লাগিয়ে দেওয়া যায় । কী নেই? যানজট, রাস্তাঘাটে দমবন্ধ করা ভীড়, ছিঁচকে চোরছ্যাঁচোড়, বেকারদের মিছিল । গরু নেই, ষাঁড় আছে, তবে তারা খেলোয়াড় । আর কিছু নামকরা লোক আর স্মরণীয় ঘটনা আছে যথা শিল্পীরা ভেলাজক্যুয়েজ, মুরিল্লো, কবি মাশাদো, নোবেলজয়ী ভিসেন্তে আলেশান্দ্রে । সেভিল্লার কারাগারে বন্দী থাকার কালে সার্ভান্টিস ডন কিহোটে লিখতে শুরু করেন, রসিনির নাপিত ফিগারোর বিয়ে এই সেভিল্লারই গির্জেতে, এবং, এই শেষ কথাটি শুনলে আপনার প্রাণ অবশ্যই উচ্ছ্বল হয়ে উঠবে, অবিস্মরণীয় নবেলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক ডন হুয়ান এই সেভিল্লাতেই তাঁর অবৈধ প্রেমের জোয়ারে বরললনাদের হাবুডুবু খাইয়েছিলেন । অবন ঠাকুর, রবি ঠাকুর, মহানায়ক -- যোগাযোগটা ধরতে পারছেন তো ।

আর অবশ্যই গির্জে আছে । না স্যার কাশীর গলির কাছাকাছি যেতে পারবে না, তবু আছে । বড়ো গির্জেটি সেভিল্লা ক্যাথিড্রাল বলেই খ্যাত, সেভিল্লা মহামসজিদের কঙ্কালের ওপর গঠিত অবিশ্বাস্য রকমের বড়ো ও ব্যারোক এবং সাঙ্ঘাতিক গথিক । বিশেষ আকর্ষণ ছিলো ক্রিস্টোফার কলম্বাসের কবর, কফিন বহন করছেন স্পেনের পুরনো চার রাজার প্রতিমূর্তি, কলম্বাসের কাছে স্পেনের ঋণের কথা কৃতজ্ঞভাবে স্মরণ করে । এপর্যন্ত ব্যাপারটা বেশ ভালোই চলছিলো, গোল বাধালো ক্যারিবিয়ান সান্টো ডোমিঙ্গোর লোকেরা । তাদের অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা কলম্বাসের এই কফিন-টফিন খুলে ২০০৪ সালে রায় দিয়েছেন যে সেভিল্লাতে কলম্বাস নেই, তাঁর তথাকথিত এই কবরটিতে যিনি বিরাজমান তিনি বড়োজোর কলম্বাসের ছেলে দিয়েগো, তিনি কলম্বাস নন । কপাল, স্যার কপাল, এতো ঘোরাঘুরি করেও ভ্যাজাল জুটলো কপালে । ভ্যাজালের কথা যখন উঠলো তখন বলি সেভিল্লার সুন্দর কমলালেবুর গাছ দেখে আর গন্ধে মাতাল হয়ে যেন এখানকার লেবু খেয়ে ফেলবেন না । পিত্তনাশ হয়ে যাবে, হাকুচ তেতো, সায়েবরা মারমালেড বানিয়ে খায় । আর এই ছবিটা দেখুন, সেভিল্লার পথের ধারে মধ্যযুগের এক সৈন্যের প্রতিমূর্তি ! [চিত্র ২৯]

আল্‌কাজার (মনে পড়ছে তো, কাজার মানে দুর্গ) আছে, কিন্তু সেটাও মেকি, দেখাচ্ছে যেন মূরদের তৈরী কিন্তু আসলে মহারাজ পেড্রোর, Pedro the Cruel কীর্তি, মালমশলা সব এধার ওধার থেকে লুটতরাজ করে আনা আর মূর মিস্ত্রিদের প্রাণের ভয়ে বেগার খাটিয়ে তৈরী । এসব ঝুট ব্যাপারে সময় নষ্ট করার দরকার নেই, আসল জিনিষ একটু পরেই আসছে আল্‌হামব্রাতে । মন্দের ভালো যেটা আছে সেটা হোলো এইরকম । উনিশশো উনত্রিশ সালে সেভিল্লাতে এক বিশ্ব মেলা, World's Fair হয়, ধুমধাড়াক্কা হয় খুব । স্পেনের সব প্রদেশ তো ছিলোই, দক্ষিণ আমেরিকার সবাই এসেছিলো, আমাদের আমেরিকাও ছিলো মেলাতে । মেলার জন্য শহরের মধ্যে খুব বাহারী প্লাজা তৈরী করা হয় -- প্লাজা দে এস্পানা আর প্লাজা দে অমেরিকা । নগরপিতারা সেই দুটি প্লাজা খুব যত্ন করে রেখেছেন, এখন বাড়ীগুলিতে দূতাবাস, নানান যাদুঘর, কিছু দোকানপত্র ইত্যাদি আছে । ছবি দিলাম তাকে অবশ্য পিটুলিগোলার মর্যাদাও দেওয়া যায়না, তবু । রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে, প্লাজার বিশাল চত্বরে অনেক লোকের মাঝে কিন্তু অদ্ভুত ভালো লাগলো । প্লাজার নানা জায়গায়, যথা বসবার বেঞ্চ, সেতুর রানা ইত্যাদিতে স্পেনের বিখ্যাত চিনেমাটির টালি দিয়ে গাঁথা আছে স্পেনের বিভিন্ন প্রদেশের ইতিহাসের নানা কাহিনী । অন্য প্লাজাতে স্পেনের নানা স্থাপত্য শৈলীর -- নাস্‌রিদ, মুদেজার ইত্যাদি মূরীয় , গথিক, রেনেসাঁ আর ব্যারোক আদি ইউরোপীয় -- চমৎকার সমন্বয় করা হয়েছে,দেখলেই বোঝা যায় এ পাকা হাতের কাজ । জানা গেলো যে স্থাপত্যবিদ্যায় এই ধারাটিকে বলা হয় ''ইতিহাসময় শিল্প'', historicist art এবং স্থাপত্যকর্মে এক নতুন পথের নির্দেশক বলে ধার্য করা হয় । [চিত্র ৩১ ও ৩২]

এবার যা দেখা হোলো না তার কথা বলি ।

বুলফাইটের বাংলা ষাঁড়ের লড়াই করলে ঠিক হবে না, কারণ বুলফাইট মোটেই শিবলাল আর লোহারামের মোকাবেলার মতো (পরশুরাম দ্রষ্টব্য) ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই নয়, বুলফাইট হোলো ষাঁড়ে মানুষে লড়াই । বুলফাইট খুব সামনাসামনি দেখার ইচ্ছে ছিলো, আমার দুবছরের বিরহিণী প্রিয়তমাকে কথা দিয়েছিলাম যে স্বহস্তে ষাঁড়ের ল্যাজ কেটে তাঁর কণ্ঠে পরাবো, তা আর হোলো না । প্রথম তো দুসপ্তাহের আগে ষাঁড়, Toro-র ক্যালেণ্ডারে জায়গা নেই, দ্বিতীয়ত কুণ্ডু স্পেশ্যাল ছুটি দিতে চাইলো না । আচ্ছা মশাই, ষাঁড়ের ল্যাজ আর কানই কেবল স্মারক হিসেবে নেয় বলতে পারেন, ষাঁড় তো অন্য উপায়েও ষাঁড়ত্ব জাহির করে থাকে? কালস্য কুটিলা গতি! এদিক আবার বুলফাইটের শেষে শুনেছি সমবেত জনতা প্রায়ই অসংযত হয়ে পড়ে, আমাদের 'পোষমানা এই প্রাণ'-এ সে ঝুঁকি নিতে ভরসা হোলো না । বন্ধুবান্ধব, বিশেষত বান্ধবীরা বকাবকি করতে লাগলেন, তোমার মন কি একেবারে পাথর, এই এতো রক্তপাত, এই বীভৎস ব্যাপার -- এই দেখতে যেতে চাইছো । আপনি তো জানেন যে আমি মহিলাদের কোনো কথারই প্রতিবাদ করিনা, তাই বলতে পারলাম না যে যখন কর্তা বিয়ারের বোতল খুলে বক্সিং দেখেন কিংবা দেশের বাড়ীতে দুর্গাপুজোয় ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং করে ছাগল আর মোষ বলি দেওয়া হয়, তখন তো ঠাকরুণের কোনো বাক্যি সরে না দেখি! 'খুফের ফর খুফ' -- আমার সিলেটি রুমমেট বলতো । স্প্যানিশ বীরাঙ্গনারা কিন্তু নিয়মিত বুলফাইট দেখেন, রুমাল বা আরো বেশী ব্যক্তিগত কিছু ক্রীড়াঙ্গনে ছুঁড়ে বাহবা দেন, বেশ ঝকমকে এবং আঁটসাঁট রণসাজে সজ্জিত ষণ্ডসূদন বীরের চরণে অকাতরে হৃদয় বিসর্জন দিয়ে থাকেন । কোন বীর্যের তাড়নায় -- ষণ্ডনিধনে প্রকাশিত নাকি যা ঘাতকের রাজবেশের আড়ালে প্রতিশ্রুত তা বলতে পারবো না । বোধহয় দুইই ।

আমেরিকায় যখন প্রথম আসি তখন টেলিভিশানের সামনে হাঁ করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার কলজে বা রেস্ত, কিছুই ছিলো না । মেক্সিকানদের টিভি চ্যানেল ছিলো চ্যানেল ছাব্বিশ, তাতে জ্যান্ত ষাঁড়ের লড়াই দেখাতো, সঙ্গে পেশাদারী ধারাবিবরণী । তখন মনের যা অবস্থা তাতে বোধহয় বোকা ষাঁড়ের নির্যাতনে আত্মপ্রসাদ বৃদ্ধি পেতো, আমার চেয়ে হতভাগ্য আর কেউ আছে এ কথা জেনে । আরো মজা এই যে আসন্ন মৃত্যুর কথা ষাঁড় কিন্তু সত্যিই জানতো না; আমি জানতাম । সেসময়ে বুলফাইটের ঘাঁৎঘোঁৎ কিছু কিছু শিখে ফেলেছিলাম, যেমন ভেরোনিকা কী (কে নয়), পিকাডোর , ব্যাণ্ডেরিলো ইত্যাদি ।

বুলফাইট ভালো কী মন্দ তা নিয়ে তর্কের শেষ নেই, যেমন নেই আমিষ আর নিরামিষ ভোজন নিয়ে । স্পেনে (বা বুলফাইট যেখানে চালু) ষাঁড়ের চাষ করা হয় তাদের কুলুজী–কুষ্ঠী দেখে । আবার ষাঁড় খেলাবার আখড়াও আছে, সেখানে ভবিষ্যৎ মাতাডোর বা টোরেরো তৈরী করা হয়, বাছুর বধ করিয়ে । তারপর যেমনটি আশা করা যায়, মধুর লোভে মাছি, ফড়ে, দালাল, ট্যাবলয়েড, টিভি, দাগাবাজ সব জোটে । খেলার দিন প্রচুর ধুমধাড়াক্কা করে দলবল নিয়ে মাতাডোর রণাঙ্গনে ঢোকেন, তারপর ষাঁড়, এল টোরো । ঢুকেই সে কোনদিকে যায়, কীভাবে যায়, সেসবের সঠিক হিসেব রাখা ভারী প্রয়োজনীয় । উদ্দেশ্য হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার –– হয় এল টোরো নয় মাতাডোর, দুজনের একজনের সদ্‌গতি । যেহেতু মাতাডোরের থেকে এল টোরো ওজনে অনেক বেশী ভারী এবং শৃঙ্গী, তাই খেলাটিকে মোটামুটি ন্যায্য করার জন্য ষাঁড়ের বুদ্ধির খর্বতার সুযোগ নিতে হয় বুদ্ধির অগম্য কিছু কৌশল খাটিয়ে । তার প্রথমটি হোলো তাকে অযথা মাঠে দৌড় করিয়ে ক্লান্ত করা, দ্বিতীয়, গুটি চারেক সূচ্যগ্র শলাকা এল টোরোর কুঁজে বিদ্ধ করে কিছু রক্তপাত ঘটানো (সেই শলাকায় ষাঁড়ের পছন্দমতো ফিতেও বাঁধা থাকে) এবং তৃতীয় হোলো বর্মাবৃত ঘোড়ায় চড়ে বর্শাপ্রয়োগে ষাঁড়ের তিন–চতুর্থাংশ ষাঁড়ত্বের দফা রফা করা । এর পর মঞ্চে আসেন মাতাডোর এবং তাঁর খেলা হোলো, প্রথম, বিধ্বস্ত ষাঁড়কে বাধ্য করা –– মাতাডোরের হাতে একটা রঙীন পতাকার মতো থাকে, নাম মুলেটা । ষাঁড় যদি ভালো বাড়ীর শিক্ষা পেয়ে থাকে, তাহলে অবশেষে সে বাধ্য পশুর মতো সেই মুলেটার সঞ্চালন অনুযায়ী তেড়ে যাবে, মাতাডোর তাতে সামান্যও বিচলিত হবেননা, আর তামাম দর্শক ওলে ওলে করে চেঁচাবেন । ষাঁড়ের বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও এই ব্যাপার বেশ কিছুক্ষণ চলে, শেষপর্যন্ত ষাঁড় যখন হাল ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি স্ট্রাইক ঘোষণা করে, ন যযৌ, ন তস্থৌ তখন তার বলিদান । একটা খুফে, সরি খোঁচাতে এটি ঘটানো দস্তুরমতো কৌশলের কাজ, একটি সরু তরোয়াল প্রয়োগে চতুর মাতাডোর সেকর্ম সমাধা করেন এবং পুষ্পবৃষ্টির মধ্য দিয়ে মৃত ষাঁড়ের কান ও লেজ সংগ্রহ করে বাড়ী যান । ষাঁড় পরে স্টেক হয়ে ব্রাহ্মণের ভোজ্য হয় এবং সেই পথে স্বর্গ লাভ করে বলে শুনেছি । ও, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, ষাঁড় যদি যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়ে থাকে তাহলে তাকে বধ করার পরিবর্তে পেন্‌শন দেওয়া হয় এবং আরো অনেক ছোটো ছোটো ষাঁড় তৈরীর কাজে লাগানো হয় । মাতাডোরের কান আর লেজের কী সদ্‌গতি হয় তা লেখেনি কোথাও ।

পর্তুগীজদের বুলফাইটটা একটু অন্যরকম । বর্বর স্প্যানিয়ার্ডদের যা পছন্দ অর্থাৎ হাজার হাজার লোকসমক্ষে ষাঁড়ের মৃত্যু, তারা তেমনটি পছন্দ করেনা মোটেই । লিসবনে ষাঁড় যথারীতি অশ্বারোহী পিকাডোর আর তীরবাহী ব্যাণ্ডেলিরোদের খোঁচা খেয়ে কিছু রক্তক্ষরণ করে খেলা দেখাতে প্রস্তুত । ক্রীড়াক্ষেত্রে ইতিমধ্যে আটটি মানুষ উপস্থিত, একটি ষাঁড়ের মুখোমুখি, একটু তফাতে । আরো বেশ কয়েক গজ পেছনে, একই লাইনে বাকী সাতজন খাড়া । প্রথম জন ষাঁড়কে একটু উত্তেজিত করে, তারপর ষাঁড়ের দিকে শন্‌শন করে দৌড়োয় । পর্তুগীজ ষাঁড়ের বুদ্ধি যেমনটি আশা করা যায়, একটু কম, সে এই মওকায় ল্যাজ তুলে না পালিয়ে ছুটন্ত লোকের সরাসরি মোকাবেলা করতে দৌড়োয় । তারপর নিউটন সায়েবের আইন অনুযায়ী যা হবার, ষাঁড়ে–মানুষে সঙ্ঘর্ষ, মানুষ ষাঁড়ের ঘাড়ে চড়ে তার শিং জড়িয়ে ধরেছে । ইতিমধ্যে পেছনের সসতজন এসে গেছে । তাদের একজন ষাঁড়ের লেজ ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে আর বাকীরা ষাঁড়কে কাতুকুতু দিচ্ছে, উদ্দেশ্য আটজনে মিলে ষাঁড়কে ভূমিসাৎ করা, কুস্তির আখড়ায় যেমনটি হয় । ষাঁড় কুপোকাৎ হলে রাউণ্ড শেষ । [চিত্র ৩০] কতো রাউণ্ড খেলা হয় তা জানিনে । একবার ইউ টিউবে গিয়ে দেখতে পারেন, সাইনাস সাফ হয়ে যাবে । খেলা শেষে ষাঁড় ব্রাহ্মণভোজনে উৎসর্গীকৃত হয়, অবশ্য নেপথ্যে, তাতে তার অক্ষয় স্বর্গবাস । প্রসঙ্গত নগরের রাজপথে ডজন খানেক ষাঁড় আমজনতার মধ্য দিয়ে পাগলের মতো দৌড়োচ্ছে, চলার বেগে গুটি কয়েক স্প্যানিয়ার্ডকে শৃঙ্গাঘাত করে, এই ছবি যদি মনে আসে তাহলে মনে রাখবেন তার নাম ষাঁড়দৌড়, running of the bulls, সেটা বছরে একবার স্পেনে প্যাম্পলোনা, Pamplona–তে ঘটে । উপলক্ষ্য সন্ত ফের্মিন, San Fermin–এর জয়ন্তী ।

একটু যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন যে আমাদের ভারতীয় পুরাণে বুলফাইটের কথা বেশ বিশদ করে লেখা আছে । সেখানে এক গেছো সুন্দরী নানান অস্ত্রে বিভূষিতা হয়ে এক মহিষাসুরকে বেশ

খেলিয়ে বধ করেছিলেন । ঠিক মাতাডোরনী নয় খানিকটা পিকাডোরনী বলতে পারেন কারণ ঠাকরুণ ছিলেন সিংহবাহিনী । রণক্ষেত্রেই কিঞ্চিৎ মদিরাসেবনে রক্তবদনা হয়ে জড়িত ভাষায় চেঁচামেচি করেছিলেন বলে শোনা যায় । দর্শক ছিলেন দেবকুল -- কোন বিবেচনায় তাঁরা এক মহিলাকে ষাঁড় তাড়াতে পাঠিয়ে নিজেরা মজা দেখছিলেন তা জানানো হয়নি তবে বাকী সব বর্ণনা বিশদভাবে পাবেন শ্রীশ্রী চণ্ডী নামের কবিতার বইতে । কাজেই এইসব ষাঁড়ের লড়াই-ফড়াই অনেক আগেই আমাদের দেশে হোতো, এটা সায়েবদের এমন কিছু মনোপলি নয় । শুনেছি একটা মেয়ের হাতে এমন মার খেয়ে বেইজ্জত হবার জন্য ষাঁড়েদের দেবতা ষাঁড়দের শাস্তি দেন যে ভবিষ্যতে তাদের যবনদের সঙ্গে বুলফাইট করেই মরতে হবে । দেখুন এইরকম ধার্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলেই বুলফাইটটা আর অতো খারাপ বোধ হবে না । দুঃখের কথা এই যে খালিস্তানসমরে আমাদের মাতাজী বধ হবার পর সেইরকম জাঁদরেল মহিলা আজকাল আর কোথাও পাওয়া যায় না, তাই মাতাডোরেরা প্রায় সকলেই পুরুষ । তবে সম্প্রতি আমাদের পশ্চিম বঙ্গে সিঙ্গুরসমরে টাটাসুরের পশ্চাদপসরণ দেখে মনে হচ্ছে এই কলিযুগ আবার এক অসুরবিনাশিনীর অভ্যুত্থানে পূতি থুড়ি পূত হবে ।

এই আশায় বুক বেঁধে এবারের মতো শেষ করাটা বাঞ্ছনীয়, কী বলেন?

**

খ্রিশ্চান স্পেন আরব শাসকদের সব চিহ্ন উৎখাত করতে চেয়েছিলো তাদের জীবন থেকে, সর্ব প্রকারে । কিন্তু স্থাননাম আর ভাষাতে যে আরবীয় সঙ্করতা প্রবেশ করেছিলো, তা যাবে কোথায় । আরবীয় অব্যয় ''আল্'' (the-র সমান) স্প্যানীয় নামের সর্বত্র -- আল্-হাম্ব্রা, জিব্র্-আল্-টার, আল্-কাজার, ইত্যাদি, ইত্যাদি । এমনকী স্প্যানিয়ার্ডরা যে ওলে, ওলে বলে বাহবা দেন, তাও বলা হয় আরবীয় 'ওয়া-আল্লাহ্, ওয়া-আল্লাহ্'-এর রূপান্তর । তেমনি ওহালা = ইন্শাল্লাহ্, আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন ।

স্পেনের লুকোনো ধন হোলো আল্হাম্ব্রা, গ্রানাডা শহরের উপকণ্ঠে । তুষারকিরীট পাহাড় সিয়েরা নেভাডা, তার সামনে তারই নুড়ি পাথর কুড়িয়ে প্রায় এক কোটি বছর আগে তৈরী লাল পাহাড় অস্সাবিকা । তার কোলে লাল দুর্গঘেরা লাল প্রাসাদ -- আল্-কোয়ালাৎ আল্-হাম্ব্রা, একটি কেল্লা, রঙ লাল । লাল কেল্লা, নামটা চেনা লাগছে? আর একটু খুলে বললে আরো চেনা চেনা লাগবে । দিওয়ান-ই-আম (Mexuar, মেশুয়ার), দিওয়ান-ই-খাস (Court of Myrtles), রঙমহল (Court of Lions) । তা লাগবে না কেন, একটি হোলো আল্হাম্ব্রা, গড়েছেন মূরেরা অনেকদিন ধরে, সুলতান আল্-আহ্মারের রাজত্বে, ১২৩৭ খ্রিস্টাব্দে তার শুরু । আল্-আহ্মারকে নাস্রিদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় । অন্যটি হোলো লাল কেল্লা, গড়েছেন এক মুঘল সম্রাট, নাম শাজাহান, মাত্র দশ বছরে, ১৬৩৮ সালে শুরু । এইসব দুর্গ, সমাধি, মসজিদ তৈরীর ব্যাপারে শাজাহান বেশ নাম কিনেছিলেন, লাল কেল্লার স্থাপত্য আল্হাম্ব্রার ধাঁচে করতে চেয়েছিলেন কীনা কে বলতে পারে । আর তাছাড়া মুঘলরা মূরদের ভায়রাভাই ।

সেই ভদ্রলোকের গল্প জানেন তো, বিয়েবাড়ীতে গায়ের দামী কাশ্মিরী শাল দিয়ে জুতো পালিশ করছিলেন কেননা শালটা বাবার আর জুতোটা তাঁর নিজের পয়সায় কেনা । আমার অবস্থা খানিকটা তাই । দিল্লীতে লাল কেল্লা দেখতে গেছি বাপের পয়সায় আর স্পেনে আল্হাম্ব্রা দেখতে অতি কষ্টে গাঁটের কড়ি বার করতে হয়েছে । তাই লাল কেল্লা দেখেছি হেলাফেলায় আর আল্হাম্ব্রা দেখা হাঁ করে । দুই স্থাপত্যের সাদৃশ্য আর তফাৎ মনে করতে পারছি না তেমন । কিন্তু আল্হাম্ব্রাতে থামের মাথায় (ক্যাপিটালে) এই অলঙ্করণ দেখে দিওয়ান-ই-খাসে যে থামের ওপর সম্রাটের আসন পাতা হোতো সেই থামের অলঙ্করণ মনে পড়ে গেলো -- নির্লজ্জ এবং হুবহু নকল মশায় । এখন সম্রাট শাজাহানকে টোকাটুকির কথা বলতে যাবে, কার ঘাড়ে কটা মাথা?

লাল কেল্লা -- কেল্লা যখন তখন কেল্লাদার আর সেপাই থাকার দরকার, আল্‌হাম্‌ব্‌রাতে তাই সেপাইদের ছাউনি আছে, আল্‌-কাজাবা। পাহাড়ের একবারে ওপরে যাতে সবদিকে নজর চলে। অনেকগুলো বুরুজ ছিলো এককালে, এখন প্রায় সব ভেঙে গেছে, পাঁচিলটাও খুব একটা জোরদার ছিলো না। আর আছে মেদিনা। আমরা যাকে মদিনা বলে জানি, সৌদি আরব দেশে হজরৎ মহম্মদের গোরস্থান, এটা কিন্তু তা নয়। মেদিনা আরবীয় শব্দ, অর্থ হোলো নগর এবং উত্তর আফ্রিকার অনেক শহরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ এলাকাকে মেদিনা বলা হয়, সাধারণত ঘিঞ্জি, কাশীর মতো কাণা গলিতে ভর্তি কিন্তু দোকানে বাজারে লোকজনে জমজমাট। আল্‌হাম্‌ব্‌রার মেদিনা হচ্ছে কেল্লার মধ্যে, যারা আল্‌হাম্‌ব্‌রার সঙ্গে বাণিজ্য বা কাজের সূত্রে জড়িত ছিলো, যথা দোকানদার, ফিরিওয়ালা, মিস্ত্রি, মজুর, তাদের থাকার জায়গা, বাজার, মাদ্রাসা, কাছারি ইত্যাদি। এখনও ভাঙাচোরা কিছু কিছু বাড়ী পড়ে আছে, কতো পুরনো জানিনা। ও, বলতে ভুলে যচ্ছিলাম, আল্‌কাজাবাতে গুটিতিনেক অন্ধকূপও পাওয়া গেছে (খোদ আল্‌হাম্‌ব্‌রায় আরো নটি) , উল্টো ফানেলের আকার, সেখানে গময়বের সঙ্গে ক্রীতদাসও রাখা হোতো। নয়তো কি আল্‌হাম্‌ব্‌রার মতো এমন এক বিরাট ব্যাপার আরব্য উপন্যাসের জিনের ফুঁতে ঘটেছিলো বলে আপনার মনে হয়?

কেল্লায় আর মেদিনায় নৃ- বা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের উৎসাহ থাকতে পারে, আমি ফূর্তি মারতে এসেছি, আমার নজর কাড়ার দুটি জায়গা -- প্রথমটি আল্‌হাম্‌ব্‌রা প্রাসাদ, Palacios Nazaries আর দ্বিতীয়টি সুলতানদের বাগিচা হেনেরালীফে, Generalife। বাগিচার কথা আগে সারা যাক, আরবী হেনেরালীফে কথার মানে হোলো স্থপতির বাগান, এবং সেদিক দিয়ে এ বাগান নামের মর্যাদা রেখেছে। বাগান যখন তখন একটা বাড়ী থাকতে হবে নয়তো ঠিক বাগানবাড়ী হবে না। দুর্গের পাঁচিলের ঠিক বাইরেই এই হেনেরালীফের বাগানের পেছনে সুলতানের গ্রীষ্মাবকাশের বাড়ী ছিলো এক, সেখান থেকে আবার পথ ঠিকমতো চিনলে সরাসরি প্রাসাদেই পৌঁছে যাওয়া যেতো ঢালু রাস্তা দিয়ে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যান্তে সুলতানরা কাছা ঠিক রাখতে পারতেন না, রাস্তা চেনা তো দূরের কথা, তাই বোধহয় এমন সুবিধের ব্যবস্থা। নিষ্পাদপ নিরম্বু মরুজাত ইস্‌লাম ধর্মের স্বপ্নস্বর্গ গাছের সারি আর বহতা নদীতে ভরা, মুসলমানদের বাগিচা তারই অনুকরণে তৈরী। মুসলমান স্থপতিরা বিশেষ প্রাধান্য দিতেন জ্যামিতিক সরলতা আর প্রতিবিম্ব বিন্যাসে, দেশের মুঘল উদ্যানের কথা মনে করুন। হেনেরালীফেও ব্যতিক্রম নয়, পয়োপ্রণালী আছে, আছে ফোয়ারা আর ফুলে ফুলে রঙের সমারোহ। মন খুশী না হয়েই যায় না তবে সুলতানদের মন কী আর আপনার-আমার মতো ছিঁচকে ব্যাপার, তাঁদের খুশী করতে আরো তদ্‌বির লাগতো নিশ্চয়। সেদিনের বাগিচা আর আজকের বাগিচার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ বলে শুনেছি। তখন ফলের বাগান ছিলো, ছাগলও চরতো আর তাছাড়া বোধহয় ফুলের সঙ্গে ফুলওয়ালীও পাওয়া যেতো। এই শূলাকৃতি সাইপ্রেস কুঞ্জে (Patio de Sultana) পুরনারী জোরায়িদা তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে ধরা পড়েছিলেন বলে গল্প চালু আছে। আমরা আদার ব্যাপারী আমাদের সে জাহাজের খবরে কী কাজ!

আল্‌হাম্‌ব্‌রা প্রাসাদের একটা নকশা দেওয়া গেলো । একটু নজর করলে দেখবেন ধাঁচটা মোটামুটি খোলা উঠোন, চারদিক ঘিরে মহল। এই উঠোনগুলোরই খ্যাতি বেশী -- মাধবীপ্রাঙ্গণ (Court of Myrtles), সিংহ প্রাঙ্গণ (Court of Lions), সুবর্ণ প্রাঙ্গণ (Golden Court)। ঢুকবেন মাচুকা প্রাঙ্গণ (Court of Machuca) দিয়ে। মাচুকা সায়েব ছিলেন পঞ্চম চার্লসের পেয়ারের স্থপতি, এই উঠোনে বসে মূরদের আল্‌হাম্‌ব্‌রাকে কী করে খ্রিশ্চান সম্রাটের ভোগে দেওয়া যায় তারই হিসেব কষতেন। পাশে মেশুয়ার (Mexuar) আরবী শব্দ মাশোয়ার থেকে নেওয়া, অর্থ মন্ত্রণাগৃহ। একসময় এখানে কাজীর, থুড়ি সুলতানের বিচারও হোতো। তারপর ''ডাইনে বেঁকে, বাঁয়ে মোচড় মেরে'' এসে পড়বেন, না আমড়াতলার মোড়ে নয়, সুবর্ণ প্রাঙ্গণে, প্রবেশপথ সরু যাতে একসঙ্গে কেবল একজন প্রবেশপ্রার্থীই ঢুকতে পারে। গায়ে লাগা কাছারি, সুবর্ণ গৃহ (Golden Room), রাইটার্স বিল্ডিং আর কি। ছাতের বাহারে ঘরের নাম। এখান থেকে যাওয়া যাচ্ছে মাধবী প্রাঙ্গণে -- প্রশস্ত, পয়োপ্রণালী শোভিত, মাধবী মালঞ্চে ঘেরা।

দূতগৃহ, Hall of the Ambasaadors হোলো দিওয়ান–ই–খাস, সুলতান তাঁর অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসকদের দর্শন দিতেন, কথাবার্তা বলতেন এবং দরকার হলে কোতলও করতেন বলে শোনা যায়। বড়ো বড়ো শির নত বা হত করা বলে কথা, তাই এই মহলটি আল্‌হাম্‌ব্‌রার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো আর অলঙ্কৃত –– একেবারে আপাদমস্তক। দেওয়ালে পোস্টার আঁটারও জায়গা নেই, সব টালি বা কোরাণের বাণী দিয়ে ভরা, একসময়ে নানা রঙের বাহারও ছিলও। স্নানের ঘর, অ্যাটাচ্‌ড বাথও আছে। মাঝের হলঘরের নাম থ্রোন রুম, অবশ্যই সুলতানের সিংহাসন থাকতো এখানে, তাকে ঘিরে নটি ছোটো ছোটো ঘর, উপগ্রহদের জন্য। সেডার কাঠের ছাদে মুসলমানদের সপ্তস্বর্গের নকশা আছে নানা কারুকৌশল তাতে। দেখতে ভালো, আমাদের গোলোকধামের কাছাকাছি কিছু হবে হয়তো, কিন্তু একেবারে আনাড়ী হওয়ার জন্য ব্যাপারটা ঠিক অনুধাবন করা গেলো না।

এখান থেকে ফুড়ুৎ করে সিংহ প্রাঙ্গণে –– আল্‌হাম্‌ব্‌রার সেরা মহল। বারোটা মার্বেলের সিংহ কুলকুচি করছে, সেই থেকে ফোয়ারা। সিংহদের সঙ্গে রাশিচক্রের যোগাযোগ ছিলো বলে শোনা যায়, ঠিক রহস্যটা কী তা জানা হোলো না। তবে সুলতানদের কালে প্রতি ঘণ্টায় এক এক বিশেষ সিংহ থুতু ফেলতো সেটা শুনলাম। তা এখন সুলতানও নেই, আর তাঁর ঘড়িও নেই। কেন জানিনা হঠাৎ বিমল মিত্রের ''সাহেব বিবি গোলাম'' বইয়ের ঘড়ি বাবুকে মনে পড়ে গেলো, তেমন একজন নিশ্চয়ই ছিলো সেকালে। একটু ভালো করে দেখুন, সিংহগুলোকে অনেকটা নাদুস্‌নুদুস বেড়ালের মতো দেখতে, দেখে স্নেহ হয়, ভয় হয় না। এইজন্যই বোধহয় আল্‌হাম্‌ব্‌রার এতো নাম। এই সিংহ প্রাঙ্গণ ঘিরে সুলতানের খাস বাস, প্রমোদ এবং জেনানাগৃহ। আবেনচেরজেস মহল, Hall of Abencerrages, ছাতের কারুকার্য দেখে মনে হয় হয় লক্ষ লক্ষ মৌচাক নয়তো হাজার হাজার বছরের ঝুল। এখানে বোয়াব্‌দিল তাঁর সুলতানার প্রণয়ীকে সপরিবারে বধ করেছিলেন বলে গল্প আছে। হ্যাঁ, সেই দীর্ঘশ্বাসের বোয়াব্‌দিল। এই মহলের মতোই আরেক মহল, নাম দুই বোনের মহল, Hall of Two Sisters, এখানে সুলতানার ''সতীন'' থাকতেন। ইস্তান্‌বুলে টোপকাপি প্রাসাদের হারেমের তুলনায় এসব কিছুই নয়, তাঁদের এক এক জনের তিন–চারশো নর্মসহচরী থাকতেন বলে শুনেছি। ''দুই বোন'' নামের পেছনে কিন্তু আরব্য উপন্যাসের মতো কাব্যিক কিছু নেই, পাশাপাশি দুটো একরকমের শ্বেতপাথর আছে তাই। ছাতে আবার সেই কারুকার্য। সুলতানরা, মূর সুলতানরা তো বটেই, খুব বীর্যবান বলে খ্যাত ছিলেন, তাঁদের শয়নগৃহের ছাতে এতো কারুকার্যের কী দরকার ছিলো, একথা কি কেউ কখনো ভেবেছেন?

রাজমহল, Hall of Kings, বিলাস ব্যসনের ঘর। দেয়ালে ছবির মারফৎ কী যেন একটা গল্প বলা হয়েছে, ঠিক যে কী তা নিয়ে তর্কের আজও মীমাংসা হয়নি। তার পাশে জাফরিমহল, Court of the Window Grille, যেখানে ওয়াশিংটন আরভিং (নীচে দেখুন) ঘর ভাড়া নিয়ে থেকে তাঁর গল্পকথা লিখতেন। সিংহ প্রাঙ্গণকে ঘিরে আরো কিছু দর্শনীয় আছে, যথা স্নানঘর, দরাশা বারান্দা Mirador de Daraxa, যেখান থেকে সুলতান গ্রানাডা শহর দেখতেন ইত্যাদি। বিশেষ বলার মতো কিছু নয়, কয়েকটা ছবি দিলাম

সম্রাট পঞ্চম চার্লস এই আল্‌হাম্‌ব্‌রার ঘাড়ের ওপর তাঁর নিজের প্রাসাদ বানিয়েছিলেন। বিশাল ব্যাপার (ইনি আবার পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন তা ভুলে যাবেন না), রেনেশাঁস স্থাপত্য, খুব একটা খারাপও দেখতে নয়, কিন্তু আল্‌হাম্‌ব্‌রার এমন সূক্ষ্ম মূর স্থাপত্যের পাশে এতোই বেমানান যে কেউ ওটাকে পাত্তা দেয়না। আমরাও দেবো না। সেখানে আল্‌হাম্‌ব্‌রা ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ের দুটি যাদুঘর আছে।

আল্‌হাম্‌ব্‌রা ঘিরে নানান গল্প, কিংবদন্তী আর লোককথা আছে, যার কোনোটাই প্রামাণ্য নয় । যেমন পুরনারী জোরায়িদার কথা । সে অবৈধ প্রেম করেছিলো, ধরা পড়েছিলো এবং সুলতান তার প্রেমিকের গুষ্টিকে আল্‌হাম্‌ব্‌রা প্রাসাদে এনে খুন করেছিলেন । বা এই প্রাসাদেরই এক মন্ত্রণাকক্ষে কলম্বাস আমেরিকা যাত্রার প্রস্তাব করেছিলেন রাজদম্পতী ফার্দিনান্দ ও ইসাবেলার কাছে । এই সব গল্পের সৃষ্টি যে কবে তা জানা নেই তবে এসব গল্পের বিবর্তন আর দীর্ঘ আয়ু যে পর্যটক, tourist–

দের মনোরঞ্জনের কারণে, এটা নিশ্চিত । আল্‌হাম্‌ব্‌রার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ভুলে যাওয়া যায় যে চতুর্দশ শতাব্দীতে সারা ইউরোপে দাসপ্রথা লোপ পেলেও মূরদের স্পেনে তার ব্যত্যয় ছিলো । খ্রিস্টানরা দাস, এই আল্‌হাম্‌ব্‌রারই মাটির তলায় আলোবাতাসহীন বন্দীশালা ছিলো তাদের জন্য । সেটা অবশ্য পর্যটকদের অবশ্যদ্রষ্টব্যের তালিকায় রাখা হয় না । চতুর্দশ শতাব্দীতে উত্তর থেকে খ্রিস্টানদের গুঁতোয় নাস্‌রিদরা একেবারে কোণঠাসা, অনুর্বর জমিতে উৎপাদন নেই, এর ওর তার কাছে হাত পেতে খাওয়া জোটে । এই পরিস্থিতে আল্‌হাম্‌ব্‌রার সৃষ্টি । যদিও অলঙ্করণে আল্‌হাম্‌ব্‌রার জুড়ি পাওয়া ভার, আল্‌হাম্‌ব্‌রাতে কিন্তু মার্বেল, অ্যালাবাস্টার ইত্যাদি দামী উপাদান নেই, আল্‌হাম্‌ব্‌রা তৈরী করা হয়েছে সহজপ্রাপ্য সস্তার মাল দিয়ে -- যথা স্টাকো, কাঠ, টালি । আল্‌হাম্‌ব্‌রার বাসিন্দাদের ইতিহাসও রক্তমাখা -- প্রথম নজন সুলতানের মধ্যে সাতজনকে বধ করা হয়েছিলো ।

আল্‌হাম্‌ব্‌রা নিয়ে অল্পবিস্তর লেখালেখি হয়েছে । এখনকার কালের ডরিস লেসিং লিখেছেন কিন্তু আল্‌হাম্‌ব্‌রাকে বর্ণনা দিয়ে জাতে তুলেছেন উনিশ শতকের আমেরিকান লেখক ওয়াশিংটন আরভিং । ''রিপ ভ্যান উইঙ্কল্‌'' হোলো আরভিঙের নামকরা গল্প । ভাগ্যচক্রে আরভিং মাস তিনেকের মতো আল্‌হাম্‌ব্‌রাতে আস্তানা গেড়েছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে প্রকাশ করেন তাঁর The Alhambra বইয়ের প্রথম সংস্করণ, সাল ১৮৩২ । আল্‌হাম্‌ব্‌রার তখন খুব দুরবস্থা, পরিচর্যার অভাবে বাগান নষ্ট, ফোয়ারা স্তব্ধ, থামের পলেস্তারা খুলে পড়ছে আর দুষ্কৃতকারীরা হয় দেয়ালের অলঙ্করণ খুলে নিচ্ছে নয় অপ্রার্থিত অলঙ্করণ হিসেবে কুলিপি, গ্রাফিটি দেগে যাচ্ছে । এই ধ্বংসোন্মুখ আল্‌হাম্‌ব্‌রাতে আরভিং দেখলেন রোম্যান্স, পেলেন বিষাদ, মূরদের হত দর্প ও গত ঐশ্বর্যে খুঁজে পেলেন মহাকালের অভিশাপ । পাঠকের হাত ধরে তাঁর সঙ্গে আল্‌হাম্‌ব্‌রা ঘুরিয়ে আনলেন, পথে পড়ে শোনালেন কোনো এক প্রস্তরলিপি, দেখালেন হঠাৎ নজরে পড়া জাফরির আড়ালে কোনো অলিন্দ -- এমনি আর কী । এখানে ছোট্টো একটু উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলানো যাচ্ছে না । আরভিং বলছেন : "It is impossible to contemplate this once favorite abode of Oriental manners without feeling the early associations of Arabic romance, and almost expecting to see the white arm of some mysterious princess beckoning from the balcony or some dark eye sparkling through the lattice. প্রসঙ্গত, ১৮৭১ সালে আরভিং তাঁর বইয়ের আপাদমস্তক নতুন করে সাজিয়ে এক দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন, সেটিরই খ্যাতি বেশী । স্পেনতত্ত্ববিদ্‌ জোসেফ ট্রেণ্ড বললেন যে বেশীর ভাগ স্থাপত্যকৃতির ফল হোলো দিনের বেলার বাড়ী, কিন্তু আল্‌হাম্‌ব্‌রা তৈরী হয়েছিলো রাতের প্রাসাদ হিসেবে । দিনের আলোয় আল্‌হাম্‌ব্‌রার যা কিছু অতি সাধারণ, অনেকসময় বেখাপ্পা বলে মনে হয়, রাতের আলো আঁধারিতে তাই হঠাৎ যেন প্রাণ পেয়ে অসাধারণ হয়ে ওঠে । আসলে আল্‌হাম্‌ব্‌রা তৈরীও হয়েছিল এই রাতের নেশায়, সারাদিন দিওয়ান-ই-আম আর দিওয়ান-ই-খাস করে নাস্‌রিদ সুলতানরা মাতোয়ারা হতে আসতেন এই রাতের পুরীতে ।

এবার এই উদ্ধৃতিটার হদিশ করতে পারছেন কিনা দেখুন । ''একসময় ঐ প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত -- সেই সকল চিত্তদাহে, সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত তৃষার্ত হইয়া আছে, . . . কেবল মেহের আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এপর্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই'' । বক্তা করিম খাঁ, শ্রোতা বরীচে তুলার মাশুল আদায়ের কাজে লিপ্ত এক বাবু, কাহিনীর নাম ক্ষুধিত পাষাণ । আমি বরীচবাসীর মতো অতো ভাগ্য নিয়ে আসিনি, আমার দৌড় দিনের আলোয় ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে, গাইডের পেছন পেছন । রাতের আল্‌হাম্‌ব্‌রা আমার দেখা হয়নি, প্রথম তো রাতের বেলায় সেখানে যেতে দেয় কিনা তাই জানিনে, তার ওপর উত্তেজিত হলে আমার পেট গুড়গুড় করে, তাতে ভূত যদিও না পালায়, রহস্যরোমাঞ্চের পরিস্থিতিতে ভীষণ ছন্দপতন হয় । কিন্তু আপনার গা ছুঁয়ে বলছি মশায়, সেই দিনের বেলাতেই সুলতানদের মন্ত্রণা কক্ষ আর বিরাম কক্ষ দিয়ে পা টিপে টিপে যাবার সময় মনে হোলো দরজার বাইরেই ''এক ভীষণ কাফ্রি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া'' বিরাজ করছেন । আরে হ্যাঁরে মশায়, ''জাফরান রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির চটিপরা দুইখানি সুন্দর চরণ''-ও দেখেছি

চোখের কোণে । তো, একটু বেশী আরক খেয়ে ফেলেছিলাম, তাতে কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে মশায় । তবে এটা মানতে হবে ঘরের কোণে ঝুলের মতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাফ্‌রির কাজ, নীচু জানলা, আলো–আঁধারের চৌখুপী কাটা বারান্দা আর অলিগলি, ঘরের মাঝে জলের কুল্‌কুল্‌ –– সব মিলিয়ে এ সব প্রাসাদ যে রাত্রের প্রাসাদ, সেটা একেবারে ঠিক ।

**

দক্ষিণ স্পেনের নাম আন্দালুসিয়া । আর সেই আন্দালুসিয়ার মুকুটমণি গ্রানাডা। আল্‌হাম্‌ব্‌রার কারণে তো বটেই, আরো কিছু আকর্ষণ আছে। তার এক হোলো সিয়েরা নেভাডা পাহাড়, স্কি স্লোপের জন্য নাম আছে খুব। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলছেন যে আফ্রিকা থেকে যখন প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা প্রথম ইউরোপে আসে তখন তারা বাসা বেঁধেছিলো আন্দালুসিয়াতে, বিশেষ করে গ্রানাডা প্রদেশে, যেখানে তাদের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে। গ্রানাডাতে গির্জেও প্রচুর, সেসব দেখতে যেতে হয়নি, ভাগ্যিস! কিন্তু আর এক জায়গায় গিয়েছিলাম, তার নাম এল্‌ আল্‌বেজিন (El Albayzin) আর পাশের পাড়া হোলো স্যাক্রোমোন্টে (Sacromonte)। আল্‌হাম্‌ব্‌রার উল্টোদিকে আল্‌বেজিন, আল্‌হাম্‌ব্‌রার থেকেও পুরনো আরবপল্লী কিন্তু সেই পুরাকীর্তি সাদা চুণকামের আড়ালে এখনো বেঁচে আছে। পাহাড়ের গায়ে উঁচুনীচু ছোটোছোটো পাথরের রাস্তা, বাড়ী সব এর ওর ঘাড়ে এসে পড়ছে কিন্তু মাঝে মাঝেই মোড় ঘুরলে গ্রানাডা শহর, নদী, আল্‌হাম্‌ব্‌রা সব মিলিয়ে চমক লাগানো ছবি, ফুলের ঝাড় উপচে রাস্তায় এসে পড়ছে। আর একটু ওপরে উঠলে স্যাক্রোমন্টে, পাহাড়ের গায়ে প্রাকৃতিক বা মানুষের খোদা গুহায় এখানকার জিপ্‌সীরা আছে প্রায় ছশো বছর ধরে। এরই মধ্যে বড়োসড়ো কিছু কিছু গুহাতে, নাম ট্যাব্‌লাও (Tablao), ছাতে তামার আর চীনেমাটির বাসন টাঙানো, তার নীচে জিপ্‌সিদের ফ্ল্যামেন্‌কো নাচের আসর বসে, নাম জাম্‌ব্‌রা (Zambraa)। ছোটো জায়গা, মোটামুটি ভর্তি দর্শক, তার মধ্যে ধীরে ধীরে জলদে পৌঁছোনো গিটার আর তাল বাদ্যের সঙ্গে কুশলী ফ্ল্যামেন্‌কো শিল্পীদের নাচ –– কম করে বললেও রোমাঞ্চকর, অপ্রত্যাশিত তো বটেই।

আন্দালুসিয়ার নাচের নাম ফ্ল্যামেন্‌কো (Flamenco)। বলাটা একেবারেই ঠিক হোলো না কেননা যে সাধুরা সন্ধান জানে তাদের কাছে ফ্ল্যামেন্‌কো শুধুই নাচ নয়, ফ্ল্যামেন্‌কোতে গান আছে, বাজনা আছে, তাল আছে, ঘরানা আছে । আসলে তাও ঠিক নয়, সর্বজ্ঞ বলবেন যে ফ্ল্যামেন্‌কো এসবের কিছুই নয় । ফ্ল্যামেন্‌কো হোলো নাচ–গান–বাজনার একটা ধরণ, একটা চলন –– যেমন ঠুংরী, যেমন কত্থক, যেমন হোরি । অনেক অনেক দিনের পুরনো শৈলী বলে শোনা যায় এবং তার মানেই হোলো যে ফ্ল্যামেন্‌কোর দুটি (অন্তত) রূপ প্রচলিত । এক হোলো আমাদের মতো অঘা পর্যটকদের অর্থভার লঘু করার একটা ছমছমাছম কারবার, আর একটা হোলো বোদ্ধাদের জন্য । দ্বিতীয়টির জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, আমার সে অভিজ্ঞতা আছে হিন্দুস্তানি উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে দন্তস্ফোটন করতে গিয়ে । প্রথমটিও মন্দ নয়, চিংড়ির পোলাও (পায়েয়া, ঐ হোলো) সহযোগে দু গেলাস শেরি নামিয়ে ঘৃতাচীর (পরশুরামের 'জাবালি' পশ্য) নাচও ভালো লাগতো, আর এতো ফুটফুটে সায়েবমেমেদের উদ্দাম নৃত্য ।

আন্দালুসিয়া হোলো 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে'–র জায়গা । এখানে মূরেরা রাজত্ব করেছে প্রায় আটশো বছর । মূরেরা নিজেরাই উত্তর আফ্রিকার বেবের এবং আরবদের মিশ্রণ, একদিকে জাতপাতের ব্যাপারে ভারী সহিষ্ণু, অন্যদিকে সাহিত্য, শিল্প আর সঙ্গীতচর্চার বিশেষ পৃষ্ঠপোষক । আইবেরীয়, কেল্টিক বা গথ খ্রিশ্চান, গ্রীক, সেফার্ডিয় ইহুদী, রোমান ইত্যাদি ইত্যাদি সবাইকেই মূররাজ্য আশ্রয় দিয়েছিলো আর বরাত ভালো থাকলে প্রতিষ্ঠাও পেয়েছেলো । পনেরোশো শতাব্দীতে খ্রিশ্চানরা মূরদের তাড়ালো, যারা রইলো তারা হয় ইনকুইজিশনের গুঁতোয়, নয় ধর্মত্যাগে অস্বীকৃত বলে সমাজের নীচুতলায়, গুহাকন্দরে লুকোতে বাধ্য হোলো । ইহুদীরাও বাদ গেলো না, খ্রিশ্চানদের সহিষ্ণু বলে নাম ছিলো না তেমন । তাদের সঙ্গে তাদের গানবাজনাও গুহাকন্দরে লুকোলো –– অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত । এই চারুকলাই হোলো ফ্ল্যামেন্‌কো।

ফ্ল্যামেন্‌কো সম্বন্ধে যা জানা যায় তা গত দুশো বছরের ইতিহাস, -- তাও আবার খুব নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা ফ্ল্যামেন্‌কোকে ধরা হোতো সমাজের নীচের মহলের বাজনা বলে, এই আমাদের তরজার মতো, ভদ্রসমাজে বিশেষ পাত্তা পেতো না -- যদিও ফ্ল্যামেন্‌কো আবহমান কাল থেকে চলে আসছে বলে অনেকে দাবী করেন । তবে ফ্ল্যামেন্‌কো যে লোকসঙ্গীত এটা ঠিক, কাদের সৃষ্টি তা না জানা গেলেও ফ্ল্যামেন্‌কো সংরক্ষণ, প্রচার আর প্রসারে জিপসি অর্থাৎ বেদের দলের ভূমিকা সবিশেষ প্রশস্ত, এ নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই । এই জিপসিরা ছন্নছাড়া, সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় দেশ-কালের বন্ধন তুচ্ছ করে, আর যেখানে যা কিছু মনোমতো পায়, তা আত্মসাৎ করে নিজেদের ছাপ লাগায় । ফ্ল্যামেন্‌কোর গানের কথা বুঝলাম না কিন্তু গানের সুর আর নাচের তালে চেনাজানা কিছু থেকে থেকেই উঁকি মেরে গেলো । নাচের পদাঘাত আর অভিনয়ে কত্থকের ছাপ অনস্বীকার্য, জাতীয়তাবাদীরা কোনটা বেশী ভালো -- ফ্ল্যামেন্‌কো না কত্থক -- তা নিয়ে তর্ক চালাতে পারেন । ফ্ল্যামেন্‌কো গাইয়েদের বেশীর ভাগই স্বরলিপি পড়তে বা লিখতে পারেন না -- তা সে তো রবীন্দ্রনাথও পারতেন না ।

দুবার ফ্ল্যামেন্‌কো দেখা গেলো -- প্রথমটি পর্দা টাঙানো, আলো ঝলমল মঞ্চে, পেশাদার শিল্পীদের পরিবেশনা । দ্বিতীয়টি গুহা অভ্যন্তরে, জিপসিদের পরিবেশনা । পেশাদার শিল্পীরা যা পরিবেশন করলেন তাতে নৃত্যকলায় যাকে অভিনয় বলে তাই, হাত আর আঙুলের কাজ, দ্বৈত বা সম্মিলিত পরিবেশন -- সবই পাওয়া গেলো, দৃপ্ত অথচ সংযত, মনে হয় যেন ফ্ল্যামেন্‌কোতে কিছু কিছু ব্যালের ছিটে দেওয়া হয়েছে। সেটা ঠিক, কথায় কথায় জানলাম পেশাদার শিল্পীরা আর কিছু না হোক পেশাগত প্রতিযোগিতার খাতিরেও ব্যালের মুদ্রা প্রয়োগ করে থাকেন। এদিকে জিপ্‌সীদের গুহায় যে নাচ দেখা গেলো সেটার প্রথম নজরে পড়ার জিনিষ হোলো প্রাণপ্রাচুর্য -- দৃপ্ত, বলিষ্ঠ, প্রাণশক্তির প্রকাশে ফেটে পড়ছে, সেখানে নরম সুর আর সূক্ষ্ম অভিনয় হবে একেবারেই বেখাপ্পা। গান এবং বাজনাও অবশ্যই নাচের সঙ্গে তাল রেখেছে। বলা বাহুল্য যে দুটি উপস্থাপনাতেই টুরিস্টদের মুখরোচক করবার মশলা ঢালা হয়েছে প্রচুর । তা হোক ।

শেষে কুশলী শিল্পীদের মণিবন্ধে মোচড় দেওয়া বিদ্যুৎঝলকে কিছু অন্তর্বাস দর্শন করে পরম পরিতৃপ্তি নিয়ে বাড়ী ফেরা গেলো ।

মেজদাকে ভোজনবিলাসী বলাটা ঠিক হবে না, মেজদাকে সকালে পিজবোর্ড দুধে ডুবিয়ে খেতে দেখা গেছে । তবে মেজদা হচ্ছেন ছুরিকাঁটার যাদুগর । আমরা দাঁত-টাঁত ভালো করে না মেজেই খাবার ঘরে ছুটতাম, মাছের চপ আর সসেজের ওপর মেজদার অপার্থিব আক্রমণ দেখার জন্য । এক দলছুট শুঁটকো কড়াইশুঁটি ভাজাকে কাঁটা বিদ্ধ করার সে কী একনিষ্ঠ সাধনা মশাই, আমরা তো কোন ছার, সামনে দিয়ে রেডিয়ো পরিহিতা মেরিলিন মনরো চলে গেলেও মেজদার ধ্যানভঙ্গ হোতো না । মুখশুদ্ধির বিচিওলা জলপাই মেজদা ছুরিকাঁটা দিয়ে খেয়ে আর্টটা মক্সো করতেন দেখেছি । তবে হ্যাঁ, খাবার আগে মদিরার ব্র্যাণ্ডটি মেজদার নিজের অর্ডারমতো হওয়া চাই । আমরা গাঁয়ের ছেলে, মহাজন যে পথে গেছেন বলে মেজদার পেছু পেছু সেই বোতলেরই তলানি চাখতাম । তাতে করে হোলো কী, স্পেন আর পর্তুগালে গিয়ে না শেরী, না পোর্ট না মাদেইরা -- কিছুই আমার চাখা হোলোনা । এখন দেশে ফিরে দেখি সবাই ছ্যাছ্যা করছে, এ যেন তারকেশ্বরে গিয়ে চরণামৃত না খেয়ে চলে আসা । মেজদাকে দুঃখের কথা বললাম, মেজদা বললেন, আরে রাম, ওসব মদ তো ব্রিটিশেরা খায়, ও কী কোনো ভদ্রলোকের খেতে আছে । আরে মশাই ব্রিটিশরা তো প্রেয়সীদের চুমুও খায় তা বলে কী সেটাও ছেড়ে দিতে হবে! বুঝলাম কাঁটাবাজি করে ভদ্রলোকের সাধারণবুদ্ধিটি একেবারে গেছে । তবে বুঝলেন না, এই হোলো কুণ্ডু স্পেশ্যালের মজা -- ''এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'' ।